ঋষি অরবিন্দের আবাল্য সহচর

মহামনীষী-শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

গ্রন্থকার শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী প্রবীণ সাংবাদিক এবং সুরসিক সাহিত্যিক। সারাজীবন রসের ভাণ্ডার নিয়ে কারবার করেছেন, মিশেছেন বিচিত্র মানুষের মেলায়। বারবেলা বৈঠকে শুধুমাত্র কবি ও সাহিত্য-সেবীরাই নন, অগ্নিযুগের মহান সারথীরাও এসেছেন, বসেছেন, বলেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, দেখিয়েছেন জীবনের সরস ফসলের সৌন্দর্য, বর্ণাঢ্য মনের সকল দুয়ার মেলে। বা'বেলা বৈঠকের অধিকারী শশাঙ্কমোহন নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন সেই অমূল্য স্মৃতিসম্ভার বর্তমান গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

সরস সাহিত্যবাসর বর্তমান কালের অনাস্বাদিত বিষয়, সেদিনের প্রাণখোলা হাসি, সে হাঁকডাক-হুঙ্কার আজ আর নেই। আজকের দিনে সব কিছুতেই ওজন করে, মেপেজুকে চলতে হয়। সবই যেন চাপাচাপি, নিশ্বাস ফেলাও ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় মন চললেও, প্রাণ চলতে চায় না। মনঃসমীক্ষণের দূরবীণে সুচিক্কণ বাগ্-বিভূতি ধরা যেতে পারে, কিন্তু সম্ভব নয় প্রাণের আরাম ও আনন্দঘন রসধারা পরিবেষণা। বজ্রকঠিন পাথুরে ছবির মধ্যেও যে মিষ্টিমধুর হাসির ঝলক ফুটে বেরোয় তার যথার্থ পরিচয় বহন করছে বর্তমান গ্রন্থ।

একসময়ে যুগান্তর পত্রিকার সাময়িকীতে অধিকাংশ কাহিনী পাঠকের আনন্দ বর্ধন করেছিল, বর্তমানে সেগুলি গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাঁদের আন্তরিক বাসনা পরিতৃপ্তিলাভ করার সুযোগ পেল। সাহিত্যের রসবিচারে কাহিনীগুলি শুধু অমরত্বের দাবি করে না, তার দাবি আরও সুদূরপ্রসারী। একদিন এই কাহিনীগুলিই তার অকাট্য প্রমাণরূপে বিধৃত হবে সেকালের সরস সাহিত্য সংলাপ ও ইতিহাস রচনাকারদের মানসচিত্র উদ্ঘাটন করার পথে। এদিক থেকে গ্রন্থখানি একালের ইতিহাসও বটে।

প্রকাশক

বিষয় সূচী

১৭

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন

১৮

আর্য পাবলিশিং-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় ছিল আর্য পাবলিশিং হাউস। বেলা দুটো পর্যন্ত সেখানে দোকান পরিচালনার কাজ করতাম। তারপর যেতাম কাগজ সম্পাদনার কাজে। বৃহস্পতিবারে আমার সেই কাগজের অফিসে ছুটি থাকত। এই বিশেষ দিনে আমাদের ওখানে সমাগম হত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) প্রমুখ প্রখ্যাত, খ্যাত এবং সদ্যোখ্যাত বহুজনের। আমাদের পাশেই ছিল বরদা এজেন্সী। এর স্বত্বাধিকারী ৺শিশিরকুমার নিয়োগীর তত্ত্বাবধানে বের হত 'কালিকলম'। এই গোষ্ঠীরও অনেকে আমাদের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। স্বর্গীয় কবিবন্ধু সুবোধ রায় বার ও সময় উপলক্ষ্য করে ঐ দিনের বৈঠকের নাম দিয়েছিল **বারবেলা বৈঠক।**

....

আজ আর তেমন তাড়া নেই। বন্ধু বিজয়ভূষণের আজ গা এলিয়ে দেবার দিন। তাই সকাল থেকেই আমার এখানে এসেছিল আড্ডা জমাতে। একা আসে নি, সঙ্গে এনেছে আর একজনকে।

দশটা বাজে নি তখনও, দোকানের আসল চেহারা দেখা যায় নি, অর্থাৎ বেচাকেনা শুরু হতে তখনও দেরি আছে।

কিসের একটা শব্দের পরেই একটা বিরাট অট্টহাস্য—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

চমকে উঠেছিলাম। দোকানের সামনেকার দরজা খোলা থাকলেও আমরা ছিলাম একটু আড়ালে। উঠে যেতেই দেখি মূর্তিমান উল্লাসদা (উল্লাসকর দত্ত)। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি আর হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি প্রায় ভীমের গদার সমগোত্র। ঐ লাঠির শব্দই প্রথমে কানে এসেছিল।

চোখোচোখি হতেই তিনি বললেন—এই কুকুরগুলো পেছনে লেগেছে, ভাই। নিস্তার নেই। যেখানে যাব সেইখানেই ছুটবে ঘেউ ঘেউ করে। দুদিন ঘুম হয় নি, তোমার এখানে আজ ঘুমাব ঘণ্টা কয়েক। থাকুক কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে ঐখানে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

আমার শোবার ক্যাম্পখাটখানা থাকত পিছন দিকে। স্বয়ং সেখানা বিছিয়ে নিয়ে সটান তার উপর পড়েই বললেন—আঃ! সন্ধ্যা ছটার আগে আর উঠছি নে, ভাই।

কুকুর বলে যাদের দিকে তিনি ইঙ্গিত করলেন তাদের মধ্যে দুজন লাল পাগড়িধারী সেপাই আর অপর ব্যক্তির পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হল, বড় না

হলেও ছোট দারোগা তো বটেই। আশ্চর্য ঘুম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একেবারে অসাড় হয়ে গেলেন তিনি। সুদীর্ঘ দেহটা অচঞ্চল, শুধু নিশ্বাসের স্পন্দনটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

বাইরে খোলা বারান্দায় সেপাই দুটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, দারোগাবাবু এধার-ওধার পায়চারি করতে লাগলেন। আমার দোকানের সহকারী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সব কথা বলে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আমারও আহার্য গ্রহণের সময় হয়েছিল যে।

ফিরে এসে দেখি দৃশ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দারোগাবাবু পদচারণা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আমার সহকারীর কাছে একটা টুল চেয়ে নিয়ে তাতে বসে পড়েছিলেন।

কিন্তু ঐভাবেই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়? আমার ফিরবার ঘণ্টাখানেক বাদে দারোগাবাবু সেপাই দুটির কানে কানে কি যেন বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বোধ হয় বলে গেলেন তারা যেন ঐখান থেকে একটুও না নড়ে, তিনি ঘুরে ফিরে আসবেন যাবেন।

ইতিমধ্যে আবার কি কাণ্ড ঘটালেন উল্লাসদা, ঠাহর করতে পারছিলাম না। বোমা-বারুদের স্বপ্ন কি তিনি এখনও দেখছেন? মারাত্মক জীব বলে ইংরেজ কি এখনও এঁদের ভয়ে সন্ত্রস্ত?

একটা ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে তিনি ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। যাবার আগে বললেন—পণ্ডিচেরিটাও ঘুরে আসব একবার। যোগ না ভোগ কি একটা হচ্ছে যেন সেখানে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

পণ্ডিচেরিতে তিনি সত্যিই গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর বইয়ের হিসাব চেয়ে পাঠালেন। বোধহয় টাকার দরকার হয়েছিল। আমি লিখে জানালাম—কানাকড়ি তো পাবেনই না; উপরন্তু এই বই নিয়ে হয়েছে জ্বালা। বইখানার নাম Twelve Years of Prison Life। বছরে তিন-চারখানা কাটে কিনা সন্দেহ! বন্দী-জীবনের কথা বাংলাতেই বা কয়জনে শোনে? তার উপর আবার ইংরাজি এবং ছাপাও হয়েছিল বোধহয় দুই হাজার। আমি তখনও আসি নি এখানে। ওগুলোকে মণ দরে দপ্তরির কাছে বিক্রি করবার অনুমতি চাইলাম তাঁর কাছে। তবু যদি দুপয়সা ঘরে আসে।

উল্লাসদা তারই জবাবে লিখেছিলেন—If you cannot dispose of them, destroy them. তাঁর ঐ কাড়া অনুমতি কিন্তু আমার হাতে না পৌঁছে

পড়েছিল গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। গোয়েন্দা বিভাগের এক দারোগা একদিন দুটি সেপাই সঙ্গে করে আমার নামে তল্লাসি পরোয়ানা এনে হাজির—দোকান খানাতল্লাস হবে।

খানাতল্লাস!

দারোগাবাবু বললেন—আপনার নাম অমুক?

আজ্ঞে হাঁ।

দেখুন তো এই চিঠিখানা।

চিঠিতে যা দেখলাম তা উপরে বলেছি।

হাঁ, কি নষ্ট করতে আপনাকে বলা হয়েছে?

আজ্ঞে বোমাও না, বারুদও না। যা নষ্ট করতে বলা হয়েছে তা ঐ দেখুন। —বলে মাথার উপরে ঘরের অর্ধেক-জোড়া প্রকাণ্ড তাকে সাজান রাশিকৃত বইয়ের দিকে নির্দেশ করলাম। সেপাই সঙ্গে করে দারোগাবাবু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে প্যাকেটগুলি খোলেন আর দেখেন—Twelve Years of Prison Life. লেখক উল্লাসকর দত্ত। লেখকের বন্দী-জীবনের কাহিনী। সরকার বাহাদুরের আইনে নিষিদ্ধ নয়।

ঐগুলির একটা বিলি-ব্যবস্থা করার জন্যে যে প্রস্তাব দিয়ে আমি উল্লাসদাকে চিঠি দিয়েছিলাম তার কপিও দেখালাম দারোগাবাবুকে।

তবু তল্লাস চলতে থাকে। কি জানি কোথায় কি আছে বলা যায় না। সাঙ্কেতিক ভাষার আড়ালেও তো আসল বস্তুর সন্ধান মিলতে পারে।

ওপাশের প্যাকেটে হাত পড়তেই দেখা গেল লেখা আছে—War, War! War against the British. War and Self-determination. না। লেখকের নামটা জানা, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু তাঁর বাক্যচ্ছটাতে দারোগাবাবুর দন্তস্ফুট হচ্ছিল না। তল্লাসের পালা শেষ হল, কেন না শেষ পর্যন্ত সব হল পণ্ডশ্রম। উল্লাসকরের চিঠিতে দারোগাবাবু শুধু ঐটুকুই দেখেছিলেন—If you cannot dispose of them, destroy them. ওর পিছনে যে উহ্য ছিল একটা বিরাট অট্টহাস্য হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আর তার প্রতিধ্বনি এসে বাজছিল আমারই কানে।

বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত এই যে উল্লাসকরের পেছনে পুলিশের অনুসরণ, এ কি সেই ধ্বংসাত্মক বাণীরই জের? হবেও বা।

বেলা বাড়তে থাকে। এদিকে একটি একটি করে বৈঠকের দলও বেড়ে

চলেছে। কিন্তু সামনে-পিছনের ব্যাপার দেখে অনেকেই শঙ্কিত হচ্ছিল। কেউ বা মুখের দিকে চেয়ে কারণ জানতে চাইছিল, আবার কেউ বা ঘরে ঢুকেই একটা অছিলায় তখনই আবার বেরিয়ে পড়ছিল।

যা বলেছিলেন তাই। সন্ধ্যা ছটা হব-হব, এমন সময় কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। উল্লাসদা বললেন—আঃ একটু ঘুমিয়ে বাঁচলাম আজ। ইচ্ছে হচ্ছে এবার একবার গড়ের মাঠের দিকে চোঁচা দৌড় দিই, আর কুকুরগুলো ছুটুক আমার পিছু পিছু—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

এই হাসি যারা দেখে নি বা এর ধ্বনি শোনে নি তাদের পক্ষে ওর নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

ভ্রূক্ষেপ নেই! লাঠিটা কয়েকবার মেঝেতে ঠুকে উল্লাসদা বেগে প্রস্থান করলেন।

অদ্ভুত লোক আর তাঁর অদ্ভুত প্রকৃতি। তাঁর এই অদ্ভুত প্রকৃতির একটা গল্প মনে পড়ে গেল তখন। গল্পটি শুনেছিলাম তাঁর কালাপানির সঙ্গী অবিনাশ ভট্টাচার্য ওরফে অবিদার কাছে।

আন্দামান থেকে মুক্তির পর বোমার আসামিরা জীবন-সংগ্রাম শুরু করলেন। এ যেন একেবারে নতুন জগতে প্রবেশ। তাঁরা যে পথে চলেন সে পথে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেও সে কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়। এইসব আত্মত্যাগী দেশসেবককে যারা হৃদয়ে আসন দিয়েছিল বলে গর্ব করত, বাস্তবক্ষেত্রে এঁদের সংস্পর্শে আসতে তাদের এখন হৃদ্‌কম্প হত। তবু ওরই মধ্যে পথ কেটে যেতে হবে। বন্ধুরা যে যার পথে চলল। উল্লাসকর বসলেন হ্যারিসন রোডে এক ঘিয়ের দোকান দিয়ে। বেচাকেনা করেন, কিন্তু বড়ই লোকাভাব; তাঁর আর কোন সহকারী ছিল না। তাঁর দোকানের সামনে একফালি বারান্দার উপর বসতে দিয়েছিলেন এক হিন্দুস্থানি চানাওয়ালাকে। ঐ চানাওয়ালার সঙ্গেই একদিন বন্দোবস্ত হল তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে বাইরে গেলে আর দোকানে চাবি দেবেন না, বিক্রির ভার ঐ চানাওয়ালার উপর। টাকা-পয়সা রাখার জায়গাটাও দেখিয়ে দিলেন চানাওয়ালাকে।

এমনি করে যায় কিছুদিন। তারপর অকস্মাৎ একদিন দুপুরবেলা উল্লাসকর এসে হাজির চেরি প্রেসে মহোল্লাসে তার লাভের খবর দিতে।

কি ব্যাপার? বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্যে ইত্যাদির চোখে বিস্ময়!

উল্লাসকর বললেন—আজ নগদ পাঁচশো টাকা লাভ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

কি রকম?

আরে ভাই, কাল দোকানে ভীষণ চুরি হয়ে গেছে। তবে দয়া করে সবটা নেয় নি। যে কটা ঘিয়ের টিন পড়ে আছে তাতে পাঁচশো টাকার মাল পাওয়া যাবে নিশ্চয়। নিলে তো সবটাই নিতে পারত, যেটুকু পড়ে আছে ঐটুকুই লাভ—হাঃ হাঃ হাঃ।

এহেন ব্যক্তির ব্যবসা যে কিছুদিন বাদেই পটল তুলল তা না বললেও চলে।

বিজয় আবার ফিরে এসেছিল সন্ধ্যার দিকে মজা দেখতে। পথে দেখা হয়েছিল আমাদের সহকর্মী গিরজেদার (গিরিজা চক্রবর্তী) সঙ্গে, তাঁকেও সঙ্গে এনেছে। কিন্তু খাঁচার বাঘ আর খাঁচায় নেই তখন।

এল হেম বাগচি তার কবিতার খাতা নিয়ে; সঙ্গে তার ক্রোড়পত্র সুবল মুখোপাধ্যায় (আমরা বলতাম সুবল সখা)। এই সুবল সখার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তখনকার দিনের অনেক তরুণ কবির কবিতাও সে মুখস্থ বলে যেতে পারত। আর নিজেও সে ছিল কবি।

দোকানের মালিক রতিকান্ত নাগ দাবার ছকটি হাতের কাছে নিয়ে উসখুস করছিলেন। না এল প্রেমেন মিত্তির, না প্রবোধ সান্ন্যাল, নজরুলও না। হয়ে যেত একচাল এতক্ষণ।

হেম বাগচির মাংসল ভারি দেহটা চেয়ারে তেমন আঁট হল না। একখানি চওড়া বেঞ্চিতে ছড়িয়ে বসে বড় বড় দুটি চোখ বিস্ফারিত করে কবিতা পাঠ শুরু করলে—

> আমার এ কাব্যলোকে কোথা হতে জানি না কখন
> বহে যায় বৈশাখের ঝড়!
> মনের বেণুর দল নুয়ে পড়ে; ছোঁয় না গগন
> থেমে যায় সহজ মর্মর।··· ইত্যাদি

কিন্তু জমল না। একটু আগেই যে ঝড় বয়ে গেছে, তার রেশ রয়েছে মনে। কবিতার রস উপভোগ করার উন্মুখ চেতনা নুইয়ে পড়েছিল, আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হেম বুঝতে পেরে তার মর্মর থামিয়ে দিলে।

ভাবছিলাম ঐ উল্লাসকর দত্তের কথা। আচ্ছা, কালাপানি-ফেরৎ আরও তো অনেককে দেখছি, এমন করে পুলিশের কেউ তো তাঁদের পেছনে লাগতে দেখি নি। একটা সূত্র ধরবার চেষ্টা করি।

মনে পড়ল একদিনের কথা। ১৯২৮ সালে সেবার কংগ্রেস বসছে কলকাতায়। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু Dominion Status দাবি পেশ করবেন।

একদিন দুপুর বেলা গলদঘর্ম হয়ে উল্লাসকর এসে উপস্থিত আর্য পাবলিশিং হাউসে। টো টো করে ঘুরছিলেন বোধ হয়। বললেন—একটাও লোক পেলাম না হে, এই প্রস্তাবগুলো কংগ্রেসে পেশ করবার জন্যে। Dominion Status—সোনার পাথর বাটি!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! একটা রিভলভার কোথাও পাচ্ছি নে যে। বাংলায় আর মানুষ নেই। বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাতের লাঠিটা মেঝেতে দুবার ঠুকেই টেবিলের উপর শুইয়ে দিলেন; ওটা যে রিভলভার নয়, এ সম্বিৎ বোধ হয় ফিরে পেয়েছিলেন।

তাঁর হাতে একখানি কাগজে গুটি আষ্টেক প্রস্তাব লেখা। দেখালেন আমাকে; কিন্তু আমার তাতে কোন আগ্রহ ছিল না, কারণ আমি জানতাম তাঁদের দিন ফুরিয়েছে।

একখানা নোটবুকও ছিল হাতে। সেখানি তাঁর ইংরাজি রচনার পাণ্ডুলিপি —Glympses।

বললেন—দেখতে পার। কেমন লাগবে জানি না। কেউ ছাপতে চায় না, বলে স্রেফ গাঁজা। হাঃ হাঃ হাঃ, Double Identity বোঝ? Double Identity? কেউ বিশ্বাস করে না। তুমি বিশ্বাস কর? আরে দ্বৈত সত্তা; তোমার মধ্যেও থাকতে পারে, আমার মধ্যেও। এই যে আমি—এই আমার মধ্যে আর একটা 'আমি' আছে, যে সূক্ষ্মভাবে দেখতে পারে, যার দেখার রীতি অন্য ধরনের, কিন্তু দৃষ্টি অসত্য নয়। আমার জীবনে এমন কত হয়েছে এবং এখনও হয়। বললে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে পাগল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

শোন বলি—সে অনেক দিনের কথা। কুমিল্লা অঞ্চল থেকে কলকাতায় আসব সেবার। কী খেয়াল হল, আমরা কয়জন নৌকা করলাম নদী পেরিয়ে স্টেশনে পৌছোতে। অনেকটা পথ। বোধহয় ভোরের দিকে গাড়ি। মিঠে জলো হাওয়া গায়ে লেগে শীত করছিল, যদিও সেটা শীতকাল নয়। গল্প করতে করতে কে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে আর কারও বা চোখে ছিল তন্দ্রা। হঠাৎ এক সময় আমি উঠে বসলাম। তখন গভীর রাত্রি। গায়ের চাদরটা বেশ করে জড়িয়ে নৌকার বাইরে দৃষ্টি দিতে দেখি বেশ জোছনা ফুটেছে। কৃষ্ণপক্ষ চলেছে তখন, তাই চাঁদ উঠেছিল দেরিতে। নদীতে অপূর্ব শোভা। নৌকা চলেছে জল কেটে কেটে, তার দুপাশে সৃষ্টি হচ্ছে ঢেউ আর সেই ঢেউগুলির উপর নেচে চলে যাচ্ছে চাঁদের আলো। এখনও মনে করলে নেশা লাগে।

আমাদের নৌকার পাশে পাশেই চলেছে আর একখানি নৌকা, ঠিক যেন

একই মাপের। হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। ও-নৌকা থেকে কে আমায় মুখ বাড়িয়ে ডাকছে না? হাঁ তাইতো। মুখের একপাশে পড়েছে চাঁদের আলো, ও-পাশটায় ছায়া, তাই ভাল করে ঠাহর করতে পারছিলাম না। আরে, ও যে সুহাস—আমার অনেক দিনের বন্ধু। চিনলাম শেষটায়। কিন্তু কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে! সারা মুখে অমন দাগ কিসের?

সুহাস স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে—বসন্ত হয়েছিল ভাই, তাই মুখময় তার চিহ্ন রেখে গেছে। উঃ সে কি কষ্ট!

তুমিও কলকাতায় যাচ্ছ নাকি?—জিজ্ঞেস করলাম।

বললে—হাঁ, এসেছিলাম সেখান থেকে, আবার ফিরে যাচ্ছি।

নৌকা চলেছিল উজানে পাল তুলে। সুহাসের নৌকায় তখন টান ধরেছে। বেশ দেখতে পাচ্ছি সুহাসের নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। এত শীগগির অত দূরে এগিয়ে গেল কি করে? আমাদের দাঁড়িরা কি ঘুমুচ্ছে? মাঝিকে ডাকলাম—ও মাঝি! মাঝি! কিন্তু মাঝি কি করবে? ও নৌকা যেন চলেছে হাওয়ায় উড়ে। কিছুক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল! ভাবলাম যাক, স্টেশনে গিয়ে তো দেখা হবে।

স্টেশনে এলাম, তখন ভোরের স্পষ্ট আলো। কিন্তু সুহাসকে কোথাও দেখতে পেলাম না। ভাবলাম তবে কী স্বপ্ন দেখলাম কাল? ব্যাপারটা ঘোর রহস্যময় বোধ হতে লাগল।

কলকাতায় পৌঁছেও মনটা অস্থির হচ্ছিল। পরের দিন সকালে উঠেই গেলাম সুহাসের বাসায় তার খোঁজ করতে। শুনলাম পরশু রাত্রে সুহাস মারা গেছে বসন্ত রোগে ভুগে। কি অদ্ভুত ব্যাপার বল তো!

এ ত গেল যখন বড় হয়েছি তখনকার কথা। এমন কত হয়েছে আমার। আর যখন ছোট ছিলাম তখনকার কথা শোন। বয়স তখন আমার বছর দশেক। বড্ড বাঁশি ভালবাসতাম; কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে শুনতে পেলে ছুটতাম তার কাছে। আমি নিজেও বাঁশি বাজাতে পারি, তা জান তুমি? জান না!—হাঃ হাঃ। অবিশ্যি এখন আর অভ্যেস নেই। যাক সে কথা; একদিন বড়ো মিঠে আওয়াজ এল কানে। মাঠের দিক থেকে আসছিল বাঁশির সুর। ছুটলাম সেইদিকে। দেখি এক ছাতিম গাছের নিচে বসে মদন বাঁশি বাজাচ্ছে। আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় সে। কোথায় পেয়েছিল সেই সুর আর কী ভালই লাগছিল আমার। সুরের তখন কী-ই বা জান আর কী-ই বা বুঝি!

তবু তন্ময় হয়ে সেই সুরে ভেসে চলেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি মদন বাঁশি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তার দেহটা ক্রমেই বেড়ে চলছে। সে যতই বাড়ে, ছাতিম গাছও ততই ওঠে উপরের দিকে আর তার শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয় চারিদিকে। আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ছাতিম গাছটি উঠেছে ততদূর আর মদনের সেই বিশাল দেহ তাতে সংলগ্ন। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ঐ ছাতিম গাছ আর আমিও ওতে বিলীন হয়ে যাচ্ছি। দার্শনিকরা মহাশূন্যের কথা বলেছেন, সে কী বস্তু তার উপলব্ধি আমার হয়েছিল কি না তা বলতে পারব না। তবে আমার যখন জ্ঞান হয়েছিল তখন জানতে পেরেছিলাম আমাকে কে যেন মাঠ থেকে তুলে এনে বাড়িতে দিয়ে গেছে।

পরে মদনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে সেদিন ছাতিম তলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল কিনা।

কই না তো!—মদন অবাক হয়ে গেল।

আচ্ছা আমার এই অভিজ্ঞতার কথায় বিশ্বাস হয় তোমার? কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, উড়িয়ে দেয়, বলে পাগল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আরে বাপু আমার যে হয়েছে অমন অভিজ্ঞতা। পাগলামি বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এই পাগলামির বিষয়েই তো অনুশীলন দরকার। আমাদের জ্ঞানের সীমা আর কতটুকু!

এরপর অনেক দিন গেছে। উল্লাসদাকে আর বড় বেশি দেখা যায় না। একদিন হুম করে এসে হাজির। অতি অদ্ভুত বেশ—মাথায় হ্যাট, পরনে হাফপ্যান্ট আর পুরোহাতা শার্ট, পায়ের বুটজোড়াটা সে যেন কেমন ধরনের। হাতের লাঠিটার নিচের দিকে অনেকটা ছুঁচলো লোহা দিয়ে বাঁধান, লাঠির মাথায় গোলাকার একটা চাকতি বসান আর তার পেছনে হাতে ধরবার একটা শক্ত আংটা।

বললেন—হনলুলু যাচ্ছি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। পাসপোর্টের জন্যে লিখেছি, দেবে কি না—

লাঠিটার দিকে নজর করছিলাম। লাঠির নিচের দিকটা দেখিয়ে বললেন—পাহাড়ে উঠতে ভারি সুবিধা হে, তাই এমন করেছি আর এই যে দেখছ মাথায় চাকতি, ওখানে থাকবে একটা ঘড়ি যাতে সময় ছাড়াও পৃথিবীর দিক নির্ণয় করা চলবে। কিন্তু আপাতত চল তো যাই একটা তেরপলের থলি কিনি, যা কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া যায়।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি রইল না কোথাও। কিন্তু যথাকালে জানা গেল তাঁর হুলুস্থুল্ যাওয়া হয় নি। তিনি যে তিমিরে সে তিমিরে অর্থাৎ ব্রাহ্মমিশন প্রেসের উপরতলার সেই ঘরখানিতে।

ঐখানেই তিনি থাকেন তখন। জীবন ধারণের জন্তে অর্থ তিনি উপায় করেন না, করবার চেষ্টাও তাঁর নেই। কিন্তু দিন তাঁর বেশ চলে যায় কয়েকজন অনুরাগী বন্ধুদের মাসিক সাহায্যে। আমাদের একান্ত পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন ঐ অনুরাগীদের একজন। একবার তিনি তাঁর ছেলেকে পাঠালেন টাকা দিয়ে আসতে। তিনি সাধারণত যা দিতেন তার অতিরিক্ত কিছু ছিল এবার। উল্লাসকর বললেন—এত কেন? ছেলেটি বললে—বাবা দিয়েছেন যে। বাবা দিলে কি হয়, উল্লাসকর প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করলেন না কিছুতেই।

পড়াশুনা করেন, কি সব লেখেনও, কোন উদ্বেগ নেই। জীবনধারণের জন্তে যেন কোন সমস্যাই নেই তাঁর।

এহেন ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে, একথা ভাবতে পারেন কি? যার নিজের কোন সম্বল নেই তার আবার বিয়ের শখ কেন? তাও আবার এমন বয়সে যখন শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী বনবাসই বিধেয়।

তবু বিধিমতে একদিন বিয়েটা হয়ে গেল। রাষ্ট্রবিপ্লবে যাঁরা বন্ধু ছিলেন সেই বারীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এলেন উৎসবে যোগ দিতে।

কিন্তু এ কিসের উৎসব? শ্মশানে যেন শিব বসেছেন শবাসনে। নববধূর অধমাঙ্গ পক্ষাঘাতে একেবারে পঙ্গু, বিশীর্ণ হাত দুখানি নাড়তে পারেন বটে কিন্তু কোন কাজে আসে না—কয়েকটা আঙুল বেঁকে শক্ত হয়ে গেছে, কোনক্রমেই সোজা হয় না।

বন্ধুরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—উল্লাস! এ কী হল?

এইটিই হওয়া দরকার বলেই হলো।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। নিরুদ্বেগ স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হাসি উল্লাসের মুখে—সে হাসির দীপ্তিতে আছে আনন্দলোকের আভাস।

বধূটি বন্ধুদের একান্ত পরিচিত—স্বর্গীয় বিপিন পালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বর ও বধূ প্রায় সমবয়সী, তাদের পরস্পরের অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকে। বসন্তের সমারোহ যখন এল জীবনে তখন উল্লাস গেছেন দ্বীপান্তরে। সুদীর্ঘকাল কাটালেন তিনি সেইখানে।

এদিকে তাঁরই জন্তে যিনি তপস্যায় বসেছিলেন সেই তপস্বিনীর অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা চলতে লাগল। একবার তাঁর জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল ঝড়।

তাতে তাঁর বাহ্য রূপান্তর কিছুটা ঘটে গেলেও মনের সজীবতাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। চলমান জীবনের এক কোণে কৈশোরের একটি মধুর স্মৃতিকে তিনি লালন করে যাচ্ছিলেন। উল্লাস যখন মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে দেখলেন অন্য একটি স্তরে উঠে, যে স্তর সমাজচেতনার ঊর্ধ্বে একটি মানসলোকের স্তর—যেখানে দুটি আনন্দবিহ্বল কিশোর-কিশোরীর চিত্ত সজীবতায় স্নিগ্ধ—যেখানে নেই কোন জৈবধর্মের আকর্ষণ। কিন্তু আজ? কিসের এ আকর্ষণ?

উল্লাস বললেন—আজকেই তো ওর প্রয়োজন আমাকে। ওকে সেবা করবে কে?

বিকৃত পঙ্গু এই বধূর বিশুষ্ক ঠোঁটের এক কোণে একটি সকৃতজ্ঞ আনন্দের বুদ্‌বুদ্ যেন ক্ষণিকের জন্যে উঠে আবার বিলীন হয়ে গেল।

এরপর অনেক দিন গেছে। বানপ্রস্থের সময় সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করে উল্লাসকরকে অনেকের সংস্রব ত্যাগ করতে হয়েছে। সময় কই তাঁর? ঐ অচল মাংসপিণ্ড ফেলে তিনি কোথায় যাবেন? নিয়ত নির্ভরশীল তাঁর পত্নীকে ছেড়ে কোথাও দুদণ্ড কাটাবার উপায় তাঁর নেই। প্রচুর অর্থ থাকলে এক রকম ব্যবস্থা করা চলে, কিংবা তেমন আত্মীয়-আত্মীয়াও যদি সঙ্গে থাকেন তবে সেও এক বল-ভরসা। কিন্তু সেসব যখন কিছুই নেই তখন এই কঠোর সেবাব্রত তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়েছে।

কী অসীম ধৈর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দুঃখের বোঝা একটানা বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে তা কল্পনায় আনতে পারা যায় না। অথবা এ কী তপস্যা? দেহ-প্রাণ-মনকে ছাড়িয়ে এ কোন্ আলোকের স্পর্শ এসে এই অনাসক্ত দুঃখব্রতীর সেবায় আনন্দের চেতনা এনে দিয়েছে! শুধু বিস্ময় নয়, এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে জীবনের একটা নবতর অর্থ যেন দীপ্ত হয়ে ওঠে!

১নং প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডে তিনি ছিলেন কিছুকাল। বৈশাখের খররৌদ্রে উত্তপ্ত ঘরখানির মধ্যে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠত; তাই সন্ধ্যা নামবার আগেই তিনি স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যেতেন ছাদের উপর; সেখানে এক কোণে একটা খাটিয়ায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বসতেন অদূরে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে। ওদিকটায় তবু গাছপালা চোখে পড়ে, যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তাও মনে হয় অনেক—অনেক বড়। ঈশান কোণে সেদিন মেঘ জমতে শুরু

হয়েছিল, জমাট কালো মেঘ। তা জমুক। কালবৈশাখীর রুদ্রলীলার প্রারম্ভে ঐ বিশেষ কোণটিতে ঘনায়মান কালো মেঘের সঞ্চার দেখতে ভাল লাগে।

উল্লাসকর কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর ঐ মেঘের দিকে চেয়ে ছিলেন। ঝড় উঠবার আগেই তিনি পত্নীকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন ঠিক। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ার আভাস এল যেন। এমন সময় নিচে কার ডাক শোনা যায়—উল্লাসদা!

কে? 'আমি অমুক।' উল্লাসকর নিচে নেমে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠে আকাশে ধূলি উড়িয়েছে। মেঘ-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ চিড়ে বিদ্যুৎরেখা খেলে গেল।

একটু দাঁড়াও, ওকে নিয়ে আসি ছাদ থেকে—উল্লাসকর আবার ছুটে গেলেন ওপরে।

আগন্তুকও গেলেন তার পিছু পিছু।

ছাদের কোণে খাটিয়ার উপর রক্ষিত স্ত্রীরূপী ঐ মাংসখণ্ডকে দুহাত দিয়ে বুকের কাছে তুলে ধরে ধূলিধূসর আকাশের দিকে একবার চেয়ে উল্লাসকর অট্টহাস্য করলেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। যেন মৃত্যুদেবতার হাত থেকে ঐ মাংসপিণ্ডকে ছিনিয়ে আনবার উল্লাস ধ্বনি সে! একটা জলন্ত বিদ্যুৎরেখা ঐ সময় বক্রাকারে ফুটে দিকচক্রবাল ভেদ করে চলে গেল।

লোকে বলে উল্লাসকর পাগল। পাগল তো বটেই। কিন্তু এমন পাগল দেখবার সৌভাগ্য কয়জনের হয়েছে?

২

দুপুরের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশের গায়ে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘমেলার তখনও ইতস্তত সঞ্চার। তারই ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত বেলার রবিরশ্মির ঈষৎ রক্তচ্ছটা।

হঠাৎ চমক লাগল ঘুঙুরের আওয়াজে। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে চেয়ে দেখি ঘরে ঢুকছে মূর্তিমান কাজি নজরুল ইসলাম নৃত্যরত—ঘুঙুরের তালে তালে মুখে বাজছে—

রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ ঘায়॥

বন্ধুদের সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। ঘরের পিছন দিকটায় দাবার আড্ডায় বসেছিল জন-পাঁচ ছয়েক। খেলাটা তখন বোধহয় চলছিল প্রেমেন মিত্রের সঙ্গে অজিত দত্তের, বাকি সব দর্শক। নজরুলের গলার আওয়াজ। আর রক্ষা আছে! দাবা ছেড়ে সব ছুটে এল সামনের দিকে—হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার!

অপরূপ বেশ নজরুলের। রেশমি গেরুয়ায় আলখাল্লা গায়ে। মাথাভরা একরাশ ঝাঁকড়া চুলের মাঝখানে সিঁথি। দুই দিকে দোদুল্যমান কেশরাশির নিচে ডাগর দুটি চোখে ঈষৎ হাসির ঝলক। সদ্য দাড়ি কামানো গালে নীলাভ দীপ্তি হেজলিন স্নোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নজরুলের সঙ্গে যারাই মিশেছে তারাই দেখেছে তার অসাধারণ প্রাণশক্তির উচ্ছলতা। ঘরে এসেছে যেন একটা আনন্দের ঢেউ। বন্ধুদের সোরগোল আর থামতে চায় না। সবাই টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল পিছন দিকের আসরে। চারিদিকে তখন সন্ধ্যার বিজলি আলো ঝলমল করছে।

একটা হারমোনিয়াম ঘরে সব সময় থাকত। নজরুল বসে গেল হারমোনিয়াম নিয়ে। ডান পায়ের ঘুঙুরটা পায়েই জড়িয়ে রইল। আমার মনে হয়, এই ঘুঙুরটা সে দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে পায়ে লাগিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।

গান শুরু হল। ডান পায়ের ঘুঙুর বাজতে লাগল তালে তালে—

রুমুঝুম্ রুমুঝুম্ কে এল নূপুর পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ ঘায়॥
সে নাচে তটিনীজল টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল ফুলদল মূরছায়॥
বিজরি জরির আঁচল ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়॥
দুলিছে মেখলা-হার শ্যামলী মেঘমালার,
উড়িছে অলক কার অলকায় ঝরোকায়॥
তালীবন থৈ তাথৈ করতালি হানে ঐ
কবি তোর ভয়ালী কই—খসিছে পূবালী বায়।

বাংলায় গজল গানের তখন মরশুম চলেছে—সৃষ্টি নজরুলের। এ গানটিও সেই গজল গানেরই অন্তত্তর। নজরুলের গারে শুধু তাল শুনেছি। কিন্তু এই

গানের যিনি নৃত্যশিল্পী সেই প্রতিভাময়ী নারীকে নৃত্যরতা অবস্থায় চোখে দেখি নি তখনও। নজরুল তাঁরই গল্প করেছিল এই আসরে সেদিন। সেই নারীর নৃত্যের মহড়া দিয়েই নজরুল এসেছিল আমাদের এখানে। তারই নেশায় তখনও সে ভরপুর!

নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধু গায়ককবি নলিনী সরকার এরই মধ্যে এক সময়ে এসে বসেছিলেন এই আসরে। তাঁরও আগে যারা এখানে এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল সুবোধ রায়, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেম বাগচি, সুবল মুখোপাধ্যায়, নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি নবীন সাহিত্যিকের দল। পাশের ঘর থেকে এসেছিলেন কালি-কলম সম্পাদক মুরলীধর বসু ও সন্ন্যাসী সাধুর্খা।

নজরুল বললে—গান আসে প্রাণে। ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে মন। সেই সঙ্গে সুরের মূর্ছনাও বাজতে থাকে। এ-গানকে আমি বেঁধে ফেলেছি ছন্দ-সুরে, কিন্তু নাচের মধ্যে এর রূপ কী দাঁড়াতে পারে, তা সদ্য চোখে দেখে এসেছি, তাই এখনও তার নেশা কাটে নি, ভাই। মেয়েটির সত্যিই প্রতিভা আছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্র সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে যে ছবিটি আমার চোখের সামনে সে ফুটিয়ে তুললে, তা তো আমার আগেই দেখা কিন্তু সে-দেখা আমার মনের চোখে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়। যা ছিল আমার অন্তরে, তাকে অপূর্ব দীপ্তিতে ফুটিয়ে তুলল এই নারী। এ রস-মাধুর্য আকণ্ঠ পান করে এসেছি। মনে হয়েছে, কবি এই নৃত্য-শিল্পীর কাছে অনেক ছোট।

কিন্তু যাই বল ভাই, গজল গানই গাই, আর খেয়ালখুশি মত খেয়াল অথবা ঠুংরি সুরের খেলায় মেতে উঠি, বাংলার যা বৈশিষ্ট্য—যা নিজস্ব সম্পদ, সেই কীর্তনের মধ্যে যে রস পাই, তার তুলনা নেই কোথাও। সারা ভারতবর্ষের হৃদয় যে বাংলা, এই ঋষিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কীর্তনে আসল রসলোকের দ্বার খুলে দেয়—হৃদয়, প্রাণ ছুটে যায় অনন্ত অসীমের পানে অবাধ, অব্যাহত। সুরের এমন অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য কীর্তন ছাড়া অন্য কোন সঙ্গীতে আছে কি? বলেই এক কলি গেয়ে উঠল—

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া/কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।

নাঃ আর না।—বলেই থেমে গেল। বললে—অনেক বড় গান ভাই, গাইতে সময় লাগবে। সবে রচনা করেছি।

হঠাৎ রসভঙ্গ হল। এ গানের সুরের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, ঐ এক

কলির টানেই প্রাণের অশ্রু যেন চোখের পাতায় নামবার উপক্রম করেছে। কিন্তু থাক। একটু ধৈর্য ধরাই ভাল। সঙ্গীতসুধার মত চা-পানের সুধাও ইতিমধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। আমরা ও-পর্ব শেষ করতাম দল বেঁধে একে একে কলেজ রো'র লিলি ক্যাবিনে। আজ এই আসরেই হল চা-পানের ব্যবস্থা। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল এ পর্ব শেষ হতে। আমাদের কিন্তু মন পড়ে ছিল কবির কণ্ঠে তাঁর নিজের রচিত কীর্তন গান শুনবার দিকে। জমজমাট আসরে অভ্যাগত সকলেই আবার প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
যত ভুলি ভুলি করি,
তত আঁকড়িয়া ধরি,
তত মরি সাধিয়া,
সাধিয়া সাধিয়া গো।...ইত্যাদি

সত্যিই সুদীর্ঘ গান। কবির কণ্ঠে সুরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ! সকলেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল। যেন সবাই ডুব দিয়েছে অন্তরের গভীরে। শব্দ-যোজনার অসাধারণত্বে গানটির যে-সব অংশ ভাবঘন রসে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে, সেই সব অংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন। যেমন—

যদি ফুল হয়ে ফুটি তরুশাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।
যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালী।

... ...

সে যে আঁখিপাতা হয়ে থাকে ঘিরিয়া আঁখি,
বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখি।
কাঁদে কাননে শুধু শুধু ফুল-তোমরা,
বনহরিণীর চোখে তারই কাজল-পরা।
তারে কেমনে ভুলিব।

আমার অঙ্গ জড়ায়ে দুলে সে রঙ্গে
সাড়ি সে নীলাম্বরী গো।
আমি কুল ছাড়িয়াছি আজ দেখি সখি
দুকূল লইয়া মরি গো।

সুরের সঙ্গে কথার এমন নিবিড় আত্মীয়তা না হলে গানের সার্থকতা কই? আলোচনা উঠেছিল তাই কথা ও সুর নিয়ে। কথা যেখানে গৌণ—সুরই প্রধান, সেখানে সত্যিকার রস পাই কি? ক্ল্যাসিক যেসব গান নিয়ে আমরা মেতে উঠি—বেশির ভাগই তার মধ্যে হিন্দি—সেসব গানের আসল আকর্ষণ সুরের বহুল বিস্তার ও লহমায়, কিন্তু প্রাণে পরিপূর্ণ রসাস্বাদ পাই না তো! হিন্দি একখানা দরবারি কানাড়া অথবা মালকোষ গানের সুরমাধুর্য উপভোগ ঠিকই করতে পারি, কিন্তু সেখানে কথা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। হয়ত কথার দুটি কলি নিয়ে গায়ক ঘণ্টা দুই ধরে সুরের কসরৎ দেখিয়ে যান অথচ কথা যে ভাবের দ্যোতক তার সঙ্গে সুরের নিবিড় নৈকট্য কতটুকু?

একজন বলে উঠল তখন বাংলার বিখ্যাত গায়ক জ্ঞান গোঁসাইয়ের কথা। ঐ দরবারি কানাড়া অথবা মালকোষ সুরের বাংলা গান তাঁর মধুর কণ্ঠে যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই উপরিউক্ত কথার তাৎপর্য স্বীকার করবেন। আহা কথা ও সুরের কী অপরূপ সংলাপ!

'আজি নিশীথ রাতে কে বাঁশি বাজায়' ইত্যাদি বাঁশির সুরের সঙ্গে মনটাও উড়ে যায় সেই সুদূর অজানার দিকে। অথবা—

একি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত
একি স্বপনঘোর মোর দিবসরাত।

সুরের চুম্বক, টানে কথার তন্ময়তা যেন একটা মায়ার রাজ্য সৃষ্টি করে দেয়। শ্রোতার চোখও যেন সেই সঙ্গে আপনাআপনিই ঝিমিয়ে পড়ে। শিল্পীরও সার্থকতা ফুটে ওঠে সেইখানে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ল একটি সঙ্গীত-আসরে রবীন্দ্রনাথের কথা। আসর বসেছে একদিন প্রখ্যাত সংখ্যাবিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবীশের বরাহনগরের বাগানবাড়িতে। গায়িকা কেশর বাঈ। প্রকাণ্ড হলঘরে বহু বিদগ্ধজনের সমাগম। তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, সৌম্যেন ঠাকুর থেকে শুরু করে তখনকার দিনে সুখ্যাত অনেক সাহিত্যিকও সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন।

পর্ব শুরু হলে কবিগুরু এসে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। সভা যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

কবিগুরুর সঙ্গে আমরাও সে আসরে শ্রোতার দল। আসরে জনসমাগম দেখলে গায়ক-গায়িকার কিংবা কোন বক্তার মন খুশিতে ভরে ওঠে, নিজেকে প্রকাশ করার উদ্যম ও উৎসাহ তাঁরা গোড়াতেই পেয়ে যান। এ আসর মহামূল্যবান, কারণ এ আসরের প্রধান শ্রোতা ঐ মহামানব রবীন্দ্রনাথ। আমরা সেখানে গৌণ মাত্র।

তানপুরা নিয়ে বসলেন কেশর বাঈ। বহুক্ষণ হাতুড়ি ঠুকে বাঁয়া-তবলায় কষে কয়েকটি চাটি মারবার পর তবলচি তাঁর তবলার বোলের সঙ্গে তানপুরার সুরের মিলন ঘটালেন। কেশর বাঈ তাঁর গানের খানিকটা ভূমিকা করে কবিগুরুকে শোনালেন। বললেন তাঁর গানের সুর 'বসন্ত্ বাহার'।

শুরু হল গান। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে গায়িকার হিন্দি গান চলল, বার বার দুটি কলিকে নিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে সুরের খেলা। ফুটন্ত একটা গোটা ফুলকে যেন দেখতে পাচ্ছি না, দেখছি একটা কুঁড়িকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। একে হিন্দি, তাতে কথাও তেমন কিছু নয়। রসাস্বাদে তৃপ্তি নেই। সুরেরই বাহার শুধু, বসন্তের প্রাণ-মাতান রূপে সুরের আত্মিক যোগ কোথায়?

বসন্ত চলিয়া গেলে শুকাবে গোলাপরাশি,
পাখী না গাহিবে গান শ্যামতরু শিরে বসি।

গীতিকারের ঐ ক্ষোভের সঙ্গে আমাদের ক্ষোভের কিন্তু মিল ছিল না। আমরা পাখির গান ঠিকই শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু বসন্ত ঋতু মরে ভূত হবার পর।

গুরুদেবের ধৈর্য অসীম। এই দীর্ঘ সময় তিনি বসেছিলেন চুপ করে চোখ বুজে। গান থামাবার পর উঠে গিয়ে বসলেন পাশের ঘরে। গায়িকাও তাঁর অনুসরণ করলেন কবিগুরুর সার্টিফিকেটের আশায়। আমরাও উন্মুখ হয়ে রইলাম তাঁর সার্টিফিকেটের ভাষা শুনবার জন্যে। যা শুনলাম তার মর্ম এই—গুরুদেব গায়িকার গান শুনে সুরের তারিফ করেছেন বটে, তবে কথার যে কাব্যরস তা কতটুকু ফুটেছে ঐ গানের কথায়? কথায় আদি-অন্তে যদি একটা গোটা ভাব কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে না উঠে, তবে তা ওজনে অনেক কম পড়ে। কথা ও সুরের মিলনে চাই একটা ভাবের সমগ্রতা, ওদের মধ্যে একটির প্রাধান্যে অপরটি ম্লান হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, এ সার্টিফিকেটে কেশর বাঈয়ের দাম বাড়ে নি।

এই বিরাট সঙ্গীত-আসরে সেদিন আমাদের যত তিক্ত অভিজ্ঞতাই হক না কেন, ষোল আনার উপর আঠার আনা পুষিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া অতিথিবৎসলা রানী মহলানবীশ। ভূরিভোজনের পর সুস্বাদু মিষ্টি পানের যে খিলি খেয়ে এসেছি, আজও তার স্বাদ যেন ঠোঁটে জড়িয়ে আছে।

আমাদের এখানে নজরুলের আসর যখন ভাঙল তখন রাত প্রায় দশটা। এমন বিমল আনন্দ অনেকদিন পাই নি।

এই আসরেই সেদিন ঠিক হল এবার দোল-পূর্ণিমায় উৎসব হবে গঙ্গার বুকে নৌকায়। সুবোধ রায় আর সন্ন্যাসী সাধুখাঁ আসবে শ্রীরামপুর থেকে নৌকা নিয়ে আর ঐ নৌকাতেই আসবে গানবাজনার জন্যে তবলা-হারমোনিয়াম এবং সেই সঙ্গে সকলের আহার্যবস্তু। নৌকা এসে লাগবে বড়বাজারের ঘাটে। আমরা সবাই উঠব গিয়ে ঐখানে।

ঐ দিনকার আসরের পরিশিষ্ট হয়েছিল তাই গঙ্গার বুকে দোল-পূর্ণিমার অম্লান জ্যোৎস্নালোকে। এ আসরেও নজরুলই ছিল 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।'

নৌকা এসে লেগেছিল ঘাটে যথাসময়ে। নিবিড় নীল আকাশের গায়ে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। মৃদু হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগছে গায়ে। এই শুভ লগ্নে নজরুলকে নিয়ে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

গঙ্গার ঘাটে তখন দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার সমারোহ। তরঙ্গ-ভঙ্গে নেচে নেচে চলেছে আলোর খেলা।

নৌকা চলল উজান বেয়ে। নজরুলের কণ্ঠে ফুটল প্রথম গান—

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়,
দখিনার দোল লেগেছে দোলন-চাঁপায়।
দোলে আজ দোল-ফাগুনে
ফুলবাণ আঁখির তূণে
দোলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায়।
দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম-পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ-তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি
দোলে কলঙ্কী শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায়॥

গানের কথা ও সুর যেন আজও জ্যোৎস্নালোকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে; ধরতে যাই, কিন্তু চকিতে হারিয়ে যায়।

গানটি নজরুল রচনা করেছিল দোলের দিনই, কৃষ্ণনগরের পরলোকগত মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্রের ভাগিনেয় দেবনন্দন মুখুজ্যের হরিশচন্দ্র মুখার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে।

অজস্র গানের ফোয়ারা ছুটেছিল সেদিন নজরুলের মুখে। বাউল, কাওয়ালি, ভাটিয়ালি, কীর্তন প্রভৃতি। সুদীর্ঘ পথ—আমাদের গন্তব্যস্থান বোটানিক্যাল গার্ডেন। নৌকা চলেছে মাঝগঙ্গা বেয়ে। দুইজন দাঁড়ির দাঁড়ের আগায় জলোচ্ছ্বাসে জ্যোৎস্নায় ঝিলিমিলি। দুকূলের আলোকমালা যেন এ জ্যোৎস্নার কাছে ম্লান।

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে চায়।
আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী নয়ন-ইশারায়॥

আমাদের সবাইকে সেদিন কে যেন নয়ন-ইশারায় নিয়ে ডেকে চলছে কোন্ স্বপন-রাজ্যে। সবারই চোখে মোহাঞ্জন। কবির সুরের সঙ্গে দাঁড়িরা দাঁড় ফেলছে যেন তালে তালে। তাদেরও প্রাণে লেগেছে দোলপূর্ণিমার হিল্লোল।

বহু ভাটিয়ালি গানের মধ্যে যে গানখানি মনে গভীর দাগ কেটে বসে গিয়েছিল, সেখানি এই—

আমার গহিন জলের নদী।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি॥
তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা-ঘর,
চরে এসে বসলাম, রে ভাই, ভাসালে সে চর।
... .
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই, ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
... ...
তুমি ভাঙো যখন কূল, রে নদী, ভাঙো একই ধার
আমার মন যখন ভাঙো, রে নদী, দুই কূল ভাঙো তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে, একবার সে ভাঙে যদি॥

নৌকা এসে ভিড়ল বোটানিক্যাল গার্ডেনের কূলে যেখানটায় জ্যোৎস্নার আলো আর গাছের ছায়া মিলে এক অপূর্ব আবছায়ার মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। ঐখানেই ভোজপর্ব শেষ করে যখন বড়বাজারের ঘাটে ফিরলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। এর পরে আর কথা নেই। কথা সব ফুরিয়ে গেছে। ঐদিন আর ফিরবে না জীবনে কোনদিন, কিন্তু তার স্মৃতি বেঁচে আছে এখনও।

৩

তমসাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরে যেমন বিদ্যুৎ খেলে যায়, তেমনি একদিন স্বাদেশিকতার ঝলক দেখা গিয়েছিল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ১৯০৫ সালের পর সারা ভারতবর্ষে যে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়ে চলেছিল তা বিস্ময়কর হলেও বিভ্রান্তিরও পথ কেটেছিল অনেক। তারপরও কেটে গেল দুই দশক। ইতিমধ্যে আন্দোলনের মোড় ফিরেছে অন্যদিকে, নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে আপামর সাধারণের মনে। লাঞ্ছনা, নিপীড়নের কিন্তু অন্ত হয় নি, বরং বেড়েই চলেছে।

সাধারণ মানুষ আশাহত হয়ে নিজেদের ধিক্কার দিচ্ছে তখন। কোথায়, সেই সাধ্যবস্তু কোথায়? কিন্তু নিরাশায় হতজ্ঞান হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তার জন্যে সত্যিকার সাধনা কোথায়? তার জন্যে নিজেদের প্রস্তুতি কই?

যুবকদের মধ্যে বেপরোয়া যারা—যাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' তারা কিন্তু নিরুৎসাহ হয় নি; তারা বললে—'ওরে মন হবেই হবে।' যাদের চরিত্রের দৃঢ়তার কাছে বাহিরের সকল বাধা তুচ্ছ হয়ে যায় তারা বুঝেছিল আমাদের দুর্বলতা কোথায়, ভঙ্গুর মনে নৈরাশ্যের অঙ্কুর কেমন করে গজায়। মুষ্টিমেয় হলেও তারাই তখনও যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছে।

উৎসাহ, উদ্দীপনা যখন সবদিকে স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখন পণ্ডিচেরির ঋষির মহাবাণী কয়জন স্মরণ করেছে?

Withdraw yourselves. Realize your own inner self and get into the heart of your country and understand what she stands for. Strive for it, work for it unceasingly, strong in faith in that and all outer things will follow.

'সব দিক থেকে আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে যাও। নিজের সত্তাকে

উপলব্ধি কর, দেশের প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়ে দেশ কি চায় তা বোঝ। তারই জন্যে তখন চেষ্টা কর, দৃঢ় বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও নিরন্তর। বাহিরের সব বস্তু তখন গড়ে উঠবে আপনা আপনি।'

দেশকে স্বাধীন করতে হবে, শত্রুর হাত থেকে দেশকে ছিনিয়ে নিতে হবে। খুব ভাল কথা। কিন্তু দেশকে ছিনিয়ে নেবার যে শক্তি দরকার তা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি কি? সেই যে দেশোদ্ধারের প্রথম জোয়ার এসেছিল তাতে তো ভেসে গিয়েছিল অনেকেই; তারপর কূলে উঠেছিল কজন? অধীর আগ্রহ ও উত্তেজনার বশে মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া খুব বাহাদুরি নয়, যদি না সেই বাহাদুরির পেছনে থাকে শক্তিপীঠের সাধনায় মুক্তির মন্ত্র। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে বক্তৃতামঞ্চে চেঁচিয়ে গলা ফাটালে কিংবা দুটো বোমা ফাটালে বা কয়েকটা পিস্তলের গুলি ছুঁড়লেই স্বাধীনতা পাকা ফলের মত গাছ থেকে টুপ্ করে হাতে এসে পড়বে, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। মরণের লোভও থাকে অনেকের, তাতে থাকে অহঙ্কারের জৌলুস। চাই নির্লোভ নিরহঙ্কার মন। নিজের মনই যদি মুক্ত না হল তবে দেশ মুক্ত হবে কেমন করে? তাই হাজার হাজার বৎসর ধরে আমরা যে ঋষিবাক্য শুনে আসছি তা হল 'আত্মানম্ বিদ্ধি'—নিজেকে জান। তখন যে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এখনও তা আছে তেমনি ভাস্বর। সত্যের রূপ বদলায় না। তা চিরদিন স্থির, অচঞ্চল, ধ্রুবজ্যোতি।

একজন বললেন—সে চেষ্টা যে একদম হয় নি তা বলা যায় না। স্বদেশী যুগে গোড়ার দিকে যে যুবকদল বোমাবারুদ নিয়ে বসে গিয়েছিল মানিকতলার বাগানে, তারাও কি নিঃশঙ্ক হতে পেরেছিল নিজেদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে? তাদের মধ্যেও কয়েকজন ছুটেছিল ভারতের নানা স্থানে শক্তিসাধনার গুরু খুঁজতে। বিপ্লবী উপেন বাঁড়ুজ্যে, দেবব্রত বসু ও বারীন ঘোষ তাদের অন্যতম।

গুরুকে নিয়ে একদিন হাজিরও করলেন বারীনদা মানিকতলার বাগানে। ইনি মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলে বাবা। এই যোগীর সঙ্গে বারীনদাই শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বরোদা অবস্থানকালে। যোগীবর ছেলেদের সব কাণ্ডকারখানা দেখে যেন হতাশ হলেন। বললেন—উঁহু, এ পথ নয়, বরং বিপদই তোমরা ডেকে আনছ।

তবে কি করতে হবে?

গুরুজি বললেন, সেই পুরান কথা—'আত্মানম্ বিদ্ধি,' স্বাধীনতা ঠিকই আসবে। তার জন্যে উতলা হয়ে ছুটাছুটি করে কোন লাভ নেই।

উপেনদা জিজ্ঞেস করলেন—কবে আসবে সেই কাম্যবস্তু ?

সাধু বললেন—আর বেশি দিন নয়।—এমনি দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর, যেন সবই তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর তৃতীয় নয়নে।

বলা বাহুল্য, লেলে বাবার কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। বিশেষ করে সন্দেহাকুল উপেনদা একবার বারীনদার মুখের দিকে চেয়ে বিরক্তির সুরে বললেন —ধ্যেৎ তোর চোখ বুজে আত্মা-টাত্মা খোঁজার নিকুচি করেছে। ঠেঙিয়ে ইংরেজকে সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদীর পারে পার করে দেব, তার জন্যে আবার ধ্যানমগ্ন হবার প্রয়োজন কি ?

লেলে বাবা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন।

কিন্তু সেই যে আত্মস্থ হয়ে সত্য উপলব্ধির প্রয়োজন, তা কি ফুরিয়েছে ? ফুরায় নি। এই চিরন্তন সত্যের সাধনা চলবে চিরদিন।

আলোচনা যখন এইভাবে চলেছে সেই সময় নলিনীকান্ত সরকার—আমাদের নলিনীদা—এক গল্প শোনালেন। সে গল্প এক সত্যানুসন্ধিৎসারই গল্প। গল্পের নায়ক তখনকার প্রখ্যাত গায়ক দিলীপকুমার রায়। নায়কের পাশে স্বয়ং উপস্থিত থেকে নলিনীদা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা-ই এখানে ব্যক্ত করছি।

দিলীপকুমারের তখন প্রবল অধ্যাত্ম-পিপাসা। কত আর বয়স হবে তাঁর তখন! এই তিরিশের কোঠায় চলছে। যুবক বললেই চলে। অমন রূপবান সুদর্শন যুবক খুবই বিরল। বিত্তবান ঘরের ছেলে—সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি; উপরন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রে উচ্চ বিলাতি ডিগ্রিধারী; এমন লোভনীয় ছেলেকে জামাই করবার লোভ অনেকেরই ছিল। কিন্তু দিলীপকুমার সে ফাঁদে পা দেন নি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অরবিন্দের বাণী ও লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তাঁদেরই জীবনাদর্শে নিজেকে গড়ে তোলবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তাঁর মনে। কোথায় আছে সেই অমৃতের সন্ধান দেবার দিশারি ? শ্রীঅরবিন্দ তো সশরীরে বর্তমান। কিন্তু এই মহাসমুদ্রের কূলে যাবার সাহস না থাকলেও তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে বিশেষ কোন আশ্বাস না পেয়ে দিলীপকুমারের তখন নদ-নদীর কূলে কূলে ফিরবার পালা চলছে। অধ্যাত্মজীবনের তীব্র ক্ষুধা মনে, কিন্তু সে ক্ষুধা মিটাবে কে ? দিলীপের যখন এমনি অস্থির-চঞ্চল মন, নলিনীদা তাঁকে একদিন তাঁর একান্ত পরিচিত ও অতীব ঘনিষ্ঠ এক যোগীর কথা শোনালেন। দিলীপের আগ্রহ বেড়ে উঠল তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার। এই যোগীর নাম বরদাচরণ মজুমদার—মুর্শিদাবাদ জিলার লালগোলা ইস্কুলের হেডমাস্টার।

খুবই অসাধারণ ব্যক্তি। বাইরে বেশি লোকের জানা না থাকলেও যারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের কাছে জানা ছিল তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা। যা হক, একটা দিন ঠিক করে নলিনীদা দিলীপকুমারকে সঙ্গে করে রওনা হলেন লালগোলায় বরদাবাবুর কাছে।

নলিনীদার মুখে দিলীপের সম্বন্ধে সব কিছু শুনে বরদাবাবু ধ্যানে বসলেন।

কিছুক্ষণ বাদে তিনি দিলীপের দিকে চেয়ে বললেন—হাঁ, ঠিক আছে। আপনার গুরু তো শ্রীঅরবিন্দ। অপেক্ষা করে আছেন তিনি আপনার জন্যে। তিনি স্বয়ং আমাকে বলে গেলেন এ কথা। তবে বর্তমানে একটুখানি বাধা আছে আপনার—সেটা আপনার ব্যাধি।

দিলীপের চোখে বিস্ময়! বলেন কি বরদাবাবু—শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এসে তাঁকে এই ভরসার কথা জানিয়ে গেছেন! আর, ব্যাধির কথা? এ সম্বন্ধে তো ঘুণাক্ষরেও আর কেউ জানে না এক দিলীপকুমার ছাড়া।

বরদাবাবু বললেন—ঐ ব্যাধিটা আপনার দেহ থেকে সরিয়ে দিলেই আর কোন বাধা নেই আপনার যোগের পথে। ওটার ব্যবস্থা আগে করুন।

দিলীপ হতবাক হলেও বরদাবাবুকে জানালেন, তিনি কাশীতে গিয়ে সেখানেও কয়েকজন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এমন কোন মহান ব্যক্তি কি তাঁর জানা আছে?

বরদাবাবু বললেন কাশীতে এক মহাযোগী আছেন, তিনি ওখানে 'সরকারজি' বলে পরিচিত। এই সরকারজি ছাড়া সেখানে দেখা করার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

যথানির্দিষ্ট দিনে নলিনীদা আর দিলীপকুমার, দুই বন্ধু একসঙ্গে রওনা দিলেন কাশীতে। ঠিকানাটা বরদাবাবুই দিয়ে দিয়েছিলেন।

অলি-গলি ঘুরে অন্ধকার একটা দোতলা বাড়িতে অবশেষে হাজির হলেন দুজনে। সে বাড়িতে কেউ থাকে বলে মনে হয় না, এমনি নিস্তব্ধ। এদিকে-ওদিকে খানিকক্ষণ পায়চারি করেও কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে নিচের তলায় এক কোনে একটি লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দুই বন্ধু তাঁকে জানালেন যে, তাঁরা এসেছেন এখানে সাধুদর্শনে। এই বাড়িতে যে সাধু থাকেন তাঁর নাম শুনেই তাঁরা এসেছেন।

লোকটির মনোভাবে যা বুঝা গেল তাতে আগন্তুকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল।

লোকটি বললেন যে দীর্ঘকাল ধরে তিনি গুরুজির সেবা করে আসছেন, কিন্তু তাঁর কৃপাকণা নাকি এক রত্তিও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি এ পর্যন্ত !

শিষ্যের মুখে মনঃক্ষোভই প্রকাশ পেল বেশি করে। তিনি অকস্মাৎ দুই বন্ধুকে ফেলে অদূরে গুরুর গো-সেবায় মন দিলেন।

সুদূর কলকাতা থেকে অনেক আশা করে তাঁরা এসেছেন কাশীতে সাধুদর্শনে, কিন্তু শেষে কি শুধু নিরাশা নিয়ে ফিরতে হবে ?

দুই বন্ধুর মনে সন্দেহও জাগে—তবে কি শিষ্যের এই ঔদাসীন্য গুরুজিরই শেখান পন্থা !

কোন কিছুর আওয়াজ হয়তো সাধুজির কানে পৌঁছেছিল। হঠাৎ দোতলার খোলা জানালা দিয়ে আওয়াজ এল কানে—ক্যা মাঙতা ?

হাতজোড় করে অনেক অনুনয়-বিনয় করে সাধুজির কৃপা ভিক্ষা করলেন তাঁরা, তাঁর দুটো উপদেশ শুনবার জন্যে।

কর্কশ কণ্ঠে সাধুজি জবাব দিলেন—কুছ্ নেহি মিলেগা হিঁয়া। ভাগো।

বাপ ! আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম ! কী বিশাল সে মুখমণ্ডল। তাতে বিশাল দুটি রক্তরাঙা চোখে ভয়ঙ্কর ভাব।

'ভাগো' বলেই যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হলেন সাধুবাবা।

ফিরে যেতে কি মন চায় ? কৃপাপ্রার্থীরা তবু অপেক্ষা করতে থাকেন। সাধুবাবার আর সাড়া নেই।

কিছুক্ষণ বাদেই আবার ঐ ভীষণ মূর্তি ভেসে উঠল জানালায়। যেন 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'।

ভীষণ হলেও স্বরের মাত্রা এবার কিছু নামিয়ে এনে সাধুবাবা বললেন—আচ্ছা, কাল আ যাও সুবা, আজ নেহি।

আশা আছে তাহলে ?

পরের দিন যথারীতি দুই বন্ধু সাধুবাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। দোতলায় মেঝেতে তিনি চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। একেবারে দিগম্বর ! বিশাল দেহটি বোধ করি লম্বায় পাক্কা সাত ফুটের কাছাকাছি। বিশাল দেহে অমন বিশাল মুণ্ডটা না থাকলে বোধ করি বেমানান হত। নিঃসংকোচে প্রণাম করে পায়ের তলায় গিয়ে বসলেন দুজনে। এবার ঐ গুরুগম্ভীর মূর্তির মুখে একটুখানি হাসির রেখা ফুটল।

দিলীপকুমারের দিকে চেয়ে সাধুজি হিন্দীতে বললেন—এই বেটা, তুই ত নামকরা গায়ক। একখানা গানা শুনিয়ে দে তো।

দিলীপ একখানা ভজন ধরলেন। কী মধুর কণ্ঠ দিলীপের আর কী অবাধ সুরের খেলা! বোধ হয় প্রেরণাও পেয়েছিলেন। মনে হল সাধুজি বেশ খুশি হয়েছেন।

তারপর নলিনীদার দিকে চেয়ে বললেন—আরে, তুইও তো গাইতে পারিস্। ধর্ না একখানা।

নলিনীদার গানাও শেষ হল। সাধুজি 'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! আনন্দ্ হো গয়া' বলে খুশির ভাব দেখালেন।

এবার, যে উদ্দেশ্যে আসা দিলীপকুমার তা-ই ব্যক্ত করলেন। গোটাকয়েক প্রশ্ন করার পর তিনি সাধুজির কাছ থেকে উত্তরের আশায় বসে রইলেন।

সাধুজি বললেন—আমার কাছে এসেছ কেন? আরে বাবা, হাঁকপাঁক করে ছুটে বেড়ালে কি গুরু মিলবে? অধ্যাত্ম পথের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলে গুরু-ই এসে তোমার হাত ধরবেন যথাসময়ে।

দিলীপকুমার সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীঅরবিন্দকে তিনি জানেন কিনা।

সাধুবাবা বললেন—জানি।

তাঁকে কি আপনি চোখে দেখেছেন?

না। চাক্ষুষ তাঁকে দেখি নি, তবে সূক্ষ্মজগতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি একজন মহাযোগী।

তাজ্জব ব্যাপার! এ সব কোন জগতের কথা? বরদাবাবু দিলীপের সম্বন্ধে সেদিন যা শুনিয়েছিলেন সেও তো এইরকম রহস্যলোকেরই কথা।

সাধুজি আকাশ পথেও অনেক স্থানে ঘুরে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে নাকি দেখা করে আসেন, এমন কথাও তখন কাশী অঞ্চলে শোনা যেত। সবই বিস্ময়কর!

তারপর উঠেছিল জন্ম-মৃত্যুর কথা। সাধুবাবা বললেন—মৃত্যু বলে কিছু নেই। জীবনটা চলেছে একটানা ঐ অব্যয়-অক্ষয় অনন্ত অসীমের পানে। বলেই তাঁর বিশাল চক্ষু দুটি তুলে ধরলেন ঊর্ধ্বদিকে। অচঞ্চল, অচপল দৃষ্টি—যেন ঊর্ধ্বলোকে জ্যোতির্ময় পরমপুরুষ তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, এমনি ভাব।

মাত্র ঐ কটি কথা বলেই সাধুজি চুপ করে গেলেন। যেন তাঁর কথা ফুরিয়েছে। চক্ষু নিমীলিত হবার ভাব এসেছে তখন।

দুই বন্ধু যেন নির্দেশ পেলেন, সাধুজি এবার ডুব দেবেন তাঁর অন্তরের অতল তলে। এবার তাঁদের বিদায় নেবার পালা। সাধুজি আশীর্বাদ করলেন তাঁদের দুজনকে।

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ইত্যাদি গীতায় এই শাশ্বত বাণী। নতুন কথা কিছু নয়। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তাঁদের মুখেই এই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। যাঁদের সাধনায় এই সত্যের উপলব্ধি হয়েছে তাঁদের কথা পুরান কথার পুনরাবৃত্তি হলেও যেন নতুন অর্থ নিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে আসে। ঊর্ধ্বলোকের রহস্য প্রাণে দিয়ে যায় একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ।

জীবনটা চলে একটা দেহ ধারণ করে—কাজের সুবিধার জন্যে। ঐ দেহটা অপটু হলেই তাকে আমরা ছেড়ে দিয়ে আর একটা দেহ ধরে নতুন করে আবার কাজ শুরু করি। এই যে প্রবহমান জীবনের ক্ষণিক ছেদ, এরই নাম দিয়েছি মৃত্যু। কথাটা জানা হলেও বোঝে কজন? আসল কথাটা হল উপলব্ধির। আত্মোপলব্ধি না হলে কথাটার অর্থ স্পষ্ট হয় না কারও কাছে। তাই জন্মান্তরের রহস্য বুঝতে হলে ডুব দিতে হয় অন্তরের গভীরে। অন্তরের আলো দিয়ে সব দেখতে হয়। সেই আলোতেই হয়ে ওঠে সব সুস্পষ্ট। এ তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্'।

সময় হলেই গুরু এসে শিষ্যের হাত ধরে পথ দেখাবেন। কাশীর ঐ মহাপুরুষের কাছে দিলীপকুমার কত বড় আশ্বাস পেলেন। আর, বরদাবাবু তো তাঁকে আগেই বলে দিয়েছেন কে তাঁর গুরু। দিলীপের মনে এসেছে একটা দৃঢ় প্রত্যয়। শুধু ইচ্ছা নয়, চাই অভীপ্সা, চাই সত্যিকারের আস্পৃহা। এই সাধারণ জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনে পৌছবার জন্যে চাই দৃঢ় পণ, ত্যাগ, তিতিক্ষা সব।

নলিনীদা যে সূক্ষ্মজগতের বার্তা শোনালেন তা আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে দুর্বোধ্য। ভারতের অধ্যাত্ম-সত্তায় ধ্যানলব্ধ সত্যের এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীঅরবিন্দের একটা লেখায় পড়েছি, তিনি যখন বোমার মামলায় আসামি হয়ে আলিপুর জেলে, সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ (তখন পরলোকে) সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাঁকে যোগ শিক্ষা দিতেন। একদিন নয়, দুদিন নয়, পক্ষকাল ধরে প্রতিদিন বিবেকানন্দের শিক্ষাদান চলেছিল। অতঃপর তাঁর অন্তর্ধান হয়, আর আসেন নি তিনি। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়ই প্রকাশ করি—

It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence......The voice spoke only on a special and limited but very important

field of spiritual experience and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on the subject.

বরদাবাবুর সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু জানা ছিল। সেইটুকু এইখানে বলে রাখি। নলিনীদা তো তাঁকে ভাল করেই জানতেন। কারণ, বরদাবাবুই নলিনীদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন লালগোলায় ওখানকার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে গ্রন্থাগারিক করে।

বহরমপুর কলেজে পড়ি তখন। থাকতাম মেন হোস্টেলে। বরদাবাবু এই হোস্টেলে মাঝে মাঝে আসতেন তাঁর পুরান ছাত্রদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে এবং তাদেরই আতিথ্য গ্রহণ করতেন।

বরদাবাবুর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় কাশীর ঐ সরকারজির দেহের মত। বলিষ্ঠ, মাংসল দেহে ছিল টকটকে সোনার রঙ। চোখ দুটিতে ফুটত একটা শান্ত দৃষ্টি, আর সেই দৃষ্টিতে মাখান থাকত সরল শিশুর হাসিটুকু। হাঁ, ব্রাহ্মণোচিত চেহারা বটে!

বরদাবাবুর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার সহপাঠী। বেশ খেতে পারতেন বরদাবাবু। চোখে দেখেছি তাঁর ভূরিভোজন এবং আহারের পর হুকায় তামাকু-সেবন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিল দুটি দল। একদল বরদাবাবুর গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ; বলত, তিনি একজন শক্তিশালী যোগী—যোগসাধনা করেন। আর এক দলের কথা ছিল, তিনি পরম ভোগী—ঘোর সংসারী; যোগ-টোগ সব ফক্কিকারি। যারা প্রথম দলে, তারা তাদের হেডমাস্টারের অনেক অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ করত, আর দ্বিতীয় দল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিত সব।

সত্যি কথা বলতে কি, যোগী সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল ও-বয়সে, তা হল যোগী মানে এক অসাধারণ ব্যক্তি—যিনি অমিত শক্তির ধারক এবং পৃথিবীতে অঘটন ঘটাবার অধিকারী; যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী, দারপরিগ্রহ যাঁর যোগমার্গের পরিপন্থী। বরদাবাবুর দিব্য গৌরকান্তি রূপ আর অসাধারণ দুটি চোখের জ্যোতির দিক চাইলে মাথা আপনা আপনিই শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসত; তবু কেন জানি না, উক্ত দ্বিতীয় দলের সন্দেহবাদটাই আচ্ছন্ন করে ফেলত মন।

যোগ-শক্তি কিনা জানি না, তবে বরদাবাবুর আত্মিক শক্তি যে প্রবল ছিল

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই হেতু অভিজাত মহলের যেমন তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন, তেমনি বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গেও তাঁর ছিল অতীব প্রিয় সম্পর্ক।

আশু মুখুজ্যে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বড় ইচ্ছা স্বয়ং উপাচার্য এসে যদি তাঁর ইস্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন তবে তাঁর ইস্কুলের জৌলুস বাড়ে। তিনি তাঁর মনের ইচ্ছা বরদাবাবুর কাছে প্রকাশ করলেন। বরদাবাবু বললেন তার জন্যে মহারাজার কোন চিন্তা নেই; তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। বরদাবাবুর অনুরোধ উপাচার্য উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

কথাটা রটে গেল, আশুবাবু যাচ্ছেন অমুক দিনে মফঃস্বলে লালগোলা ইস্কুলে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণে। লালগোলার মহারাজা দানবীর বলে প্রখ্যাত ছিলেন। যোগীন্দ্রনারায়ণের নাম তখন কে না জানে। অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তিনি ছিলেন গৃহী-সন্ন্যাসী। অন্যান্য ধনবান ব্যক্তির মত তিনি ভোগ-লালসায় মত্ত হন নি। বেশভূষায় ছিল না কোনই পারিপাট্য, অতি সরল সাধারণ জীবন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহু প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান ছিল প্রচুর। জনকল্যাণেও তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। এ-হেন দানবীরের ইস্কুলে আশুবাবু যাচ্ছেন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কট যেমন লেগেই আছে, তখনও তেমনি ছিল। সুতরাং আমাদের মত অনেকেই তখন ভেবেছিলেন কোন্ না লাখটাকা এবার আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করে আনবেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি আশুবাবু লালগোলায় পদার্পণ করে ইস্কুলের পারিতোষিক সভার পৌরোহিত্য করলেন। আমাদের প্রত্যাশিত দানের কোন খবরই পাওয়া গেল না। আশুবাবু কোন সর্তে লালগোলায় যান নি, গেছেন বরদাবাবুর প্রতি প্রীতিবশত।

৪

বন্ধুবর প্রবোধ সান্যালের মুখে একদিন শুনলাম নজরুল যোগসাধনা করছে।

তাই নাকি? সে আবার কবে থেকে?

অনেক দিন হয়ে গেল। কেন, জান না তুমি?

না, এই প্রথম শুনলাম তোমার মুখে। কার কাছে দীক্ষা নিয়েছে নজরুল?

বরদাবাবুর কাছে। লাল—

ব্যস্। আর বলতে হল না। বুঝলাম লালগোলার হেডমাস্টার বরদা মজুমদারের কাছে।

আগেই বলেছি তাঁর ছাত্রদের কাছে শুনতাম তিনি সংসারে থেকেই যোগ-সাধনা করেন। যোগমার্গে তিনি অনেক উচুতে উঠে গেছেন। আমার ছাত্রাবস্থায় তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি, এ কথাও বলেছি।

উত্তরকালে তিনি আরও উচু স্তরে উঠে গেছেন, একথাও জেনেছি। সুতরাং নজরুল সম্বন্ধে এই খবরটা পেয়ে বিস্মিত হলেও অত্যন্ত খুশি হলাম।

কবি নজরুলের মত অমন স্বচ্ছ, নির্মল, অমায়িক প্রাণবন্ত মানুষ আধার হিসাবে যে খুবই বড় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

এরপর আরও অনেক বন্ধুর মুখে নজরুলের যোগসাধনার কথা শুনেছি। কলকাতায় বরদাবাবুর অনেক ভক্ত জুটেছিল, তার মধ্যে সাহিত্যিক বন্ধুও কয়েকজন ছিল। বরদাবাবুর অসাধারণ যোগশক্তি ও নানা অলৌকিক ব্যাপারের কাহিনী তখন অনেকের মুখে মুখে ফিরত।

পুজা, বড়দিন ও গ্রীষ্মের ছুটিতে বরদাবাবু কলকাতায় চলে আসতেন এবং ছুটিটা কাটাতেন এইখানেই। উঠতেন তিনি প্রায়ই মোহিনীমোহন রোডের মল্লিক-বাড়িতে।

উত্তরকালে এই মহাযোগীকে দেখার আগ্রহও তখন হয়েছিল আমার এবং একদিন সে সুযোগ পেয়েও তা হারাতে হল—এমনি দুর্ভাগ্য আমার।

চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি একদিন অফিসে ফিরব বলে। বিকালের দিকে হঠাৎ একখানা মোটর গাড়ি এসে আমার সামনে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। মোটর থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমাকে ইশারায় কাছে ডেকে নজরুল জিজ্ঞেস করলে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন।

বললাম—ট্রামের অপেক্ষায় আছি।

ভবানীপুরে যাবে?

না। অফিস থেকে একটা কাজে এসেছি এদিকে, আবার ফিরব অফিসে।

ধোৎ। নাই বা গেলে অফিসে। গেলে এক মহাপুরুষকে দেখাতাম।

মহাপুরুষের নামও বললে নজরুল। এ মহাপুরুষ আমার চেনা, কিন্তু সে বহুদিনের আগেকার কথা যখন তাঁকে দেখেছিলাম বহরমপুরে। নজরুল তাঁর কাছে যোগে দীক্ষা নিয়েছে, এ খবরও পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই বরদাবাবুর

রূপান্তর ঘটেছে অনেক—যাঁর আকর্ষণে বহু লোক এখন শ্রদ্ধায় নত হয়ে তাঁকে ঘিরে থাকে। লোভটা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু কর্তব্য বড় দায়—অফিসের দায়িত্ব এড়ান যায় না। যাওয়া আর হল না এবং শেষ পর্যন্ত আর কখনও তাঁর কাছে যেতে পারি নি, কারণ এর পরে আর বেশি দিন তিনি বেঁচে ছিলেন না, বোধ হয় ১৯৪০-এর শেষের দিকে তাঁর দেহান্তর ঘটেছিল।

তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুলই বোধ হয় প্রথম মোটর-বিলাসী। বিলাস বললে বোধ হয় ভুল হবে, কারণ কর্মের খাতিরে তখন তাঁকে বহু স্থানে ঘোরাঘুরি করতে হত। এক কথায়, নজরুলের তখন বৃহস্পতির দশা। কবি বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা রূপে দেখা দিয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে সেসময়ে নজরুলের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য—একাধারে সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার এবং সঙ্গীত-শিক্ষক। প্রচুর অর্থাগম। ঘরে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। ঐ গ্রামোফোন কোম্পানিরই দাক্ষিণ্যে নজরুল কিনেছিল একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি এবং সে গাড়িতে বন্ধুবৎসল নজরুল পথে দেখা হলে যে-কোন বন্ধুকে ডেকে তার সহচর করে নিত।

অসীম শ্রদ্ধা ছিল নজরুলের বরদাবাবুর প্রতি। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত বরদাবাবু সম্বন্ধে। শুধু নজরুল নয়, আরও অনেক বন্ধুর মুখে বরদাবাবুর অলৌকিক শক্তির কথা শুনে অবাক হয়ে যেতাম।

ভক্তদের সঙ্গে তিনি অতি সহজভাবে কথা বলতেন, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কোন বালাই নেই, যেন সব বন্ধু—একান্ত আপনার জন।

ধূমপান করতে করতে হাসিঠাট্টাও চলেছে অত্যন্ত লঘুভাবে, এমন সময় হঠাৎ কোন ভক্ত হয়ত একটা গভীর বিষয়ে প্রশ্ন করে বসল। ধূমপানে রত বরদাবাবুর চক্ষু দুটি অমনি মুদ্রিত হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই তিনি যা জবাব দিলেন তাতে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল। অতি সহজেই তিনি ধ্যানস্থ হতে পারতেন এবং ধ্যানলব্ধ সত্যকেই তিনি প্রকাশ করতেন।

প্রবোধ সান্যালের মুখে শুনেছি, আমাদের আর একজন বন্ধু একবার বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর, সুশ্রী এই বন্ধুর চেহারা। আলাপের পর কিছুক্ষণ এই বন্ধুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—

আঃ কী চমৎকার এই নাভি পর্যন্ত! নিজের নাভি হাতে স্পর্শ করে একথা বললেন। সব ঠিক আছে কিন্তু ঐ নাভির নিচেই যত গোলমাল। ঐ দিকটা যদি একটু মোড় ফিরত তবে হত সোনা।

এমনি ছিল অনেক সময় বরদাবাবুর চাঁচা-ছোলা উক্তি। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে মুহূর্তে তার ভিতরকার সবটা যেন যোগ-দৃষ্টির আলোয় পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে দেখে এসে তবে তা প্রকাশ করতেন। অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করতেন অতি সহজে হাসিমুখে, কোন তিক্ততা প্রকাশ পেত না।

এইরূপে বরদাবাবুর ধ্যানলব্ধ সত্যের একটা কাহিনী যা অতীব বিস্ময়কর তাই এখানে বলব। বরদাবাবুর বৈঠকে যাঁরা একদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই একজনের মুখে শুনেছি এ কাহিনী।

একজন প্রশ্ন করেছিলেন—আচ্ছা, ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে শ্রেষ্ঠতম যোগী কাকে বলা যায়?

বরদাবাবু বললেন—আমার মনে হয় 'সরকারজি'।

এই সরকারজির নাম উপস্থিত কারও জানা ছিল না। কে সেই ব্যক্তি? কি ধরনের যোগী তিনি, তা জানবার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে উঠল। বার বার বরদাবাবুকে অনুরোধ করা হল এই যোগী সম্বন্ধে কিছু বলতে। বরদাবাবুর মুখে যা শোনা গেল তা ঐ কাশীতে অবস্থিত উলঙ্গ যোগী যাঁর সঙ্গে নলিনীদা ও দিলীপকুমার সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনিই সরকারজি নামে তখন পরিচিত।

বরদাবাবু বললেন—বলি তবে এই সরকারজির কথা। অনন্যসাধারণ এই মহাপুরুষ। এঁর সব কাণ্ডকারখানাই ছিল আলাদা। জন্ম জন্মান্তর ধরে এ যাবৎ কত খেলাই খেলে আসছেন। যুগে যুগে এই শিবতুল্য যোগীকে ভারতের কত সাধক যে গুরু বলে মান্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম এখানকার সকলেরই জানা। বাবা বিশ্বনাথ তো স্থাণু হয়ে আছেন, আর এই উদোম নেংটা বিশ্বনাথ ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন কাশীতে। কখনও বা গঙ্গায় ডুবে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা ভেসে বেড়াতেন এক প্রান্ত থেকে সুদূর আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। কখনও বা বসতেন মণিকর্ণিকার ঘাটে এবং ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন কতক্ষণ, তার হিসাব ছিল না।

একদিন এই মণিকর্ণিকার ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন সরকারজি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা হতেই রতনে রতন চিনে ফেললেন। উভয়ের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। ত্রৈলঙ্গ স্বামী গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করে সরকারজির পদবন্দনা করলেন। এহেন ব্যক্তি এই সরকারজি।

একবার হল কি, প্রয়াগতীর্থের ওখান থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে উঠে এলাহাবাদের এক চওড়া রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদের মত বাড়ির

ফটকে এসে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। বাড়িটা এক খ্যাতনামা বাঙালি আইন-জীবীর। বিশাল-দেহ এই উলঙ্গ সাধুর ভয়াবহ রূপ হলেও কিন্তু তাতে ছিল একটা শান্ত-শ্রীর ভাব। ভয় হলেও ভক্তিতে যেন মাথাটা আপনাআপনি নুইয়ে আসে।

জানই তো সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে এ দেশের নর-নারীর কি ভাব হয়। হাজার হাজার বছরের সংস্কার এটা। অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র এই ভারতভূমিতে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রশ্ন কর না এর ভালো-মন্দ নিয়ে। আমি বলছি এটাই হল এদেশের বৈশিষ্ট্য।

সাধুজি অন্দরমহলে প্রবেশ করতে চান। ইতিমধ্যে বাইরের কয়েকজন লোক ফটকের সামনে জমায়েত হয়েছে। দোতলা থেকে বাড়ির মালিকের বুড়ি মায়ের নজরে পড়েছিল এই অসাধারণ সাধু।

বুড়ি মা উপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এসে সাধুজির পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর কৃতী পুত্রও এসে হাজির হলেন।

পুত্র মাকে জিজ্ঞেস করলেন সাধুজি তাঁর চেনা কিনা। মা বললেন—না বাবা, এই প্রথম দেখলাম, আর কখনও এঁকে এর আগে—

পুত্র অবাক হয়ে সাধুজির দিকে চেয়ে রইলেন। সাধুজি তখন মায়ের মুখপানে চেয়ে হাসছেন। কী বিমল হাসি! সে হাসির তুলনা হয় না। যেন যুগ-যুগান্তর ধরে তাঁদের জানা-চেনা।

বুড়ি মা তখন সাধুজিকে বিনয় করে বললেন—বাবা, দয়া করে যখন এখানে পদধূলি দিয়েছেন তখন এখানেই চারটি আহার করে যাবেন, তাহলে ধন্য হব।

সাধুজি প্রতিশ্রুতি দিলেন নিশ্চয়ই বুড়ি মাকে তিনি ধন্য হবার সুযোগ দেবেন।

হঠাৎ সাধুজির কি খেয়াল হল, তিনি দারোয়ানের দিকে চেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন মেঝে থেকে তাঁকে টেনে উপরের দিকে সে তুলতে পারে কিনা।

ভয়ে ভীত হলেও সাহস করে দারোয়ান এগিয়ে এলে। দুহাতে সাধুজির কোমর জাপটে ধরে প্রাণপণে তাঁকে উপরের দিকে উঠাবার চেষ্টা করলে দারোয়ান। বাপ! নট্‌-নড়ন-চড়ন—নট কিচ্ছু। যেন হিমালয় পাহাড়! দারোয়ান তখন ঘর্মাক্ত কলেবর।

অতঃপর ডাক পড়ল বাগানের মালীর! মালীও ফেল মারল।

তারপর দুই পালোয়ান ভৃত্যের পালা। তারাও ফেল মেরে গেল।

এবার ঐ চার পালোয়ান মিলে হাত লাগিয়ে সাধুজিকে উপরে টেনে তুলবার

কসরৎ করলে কিছুক্ষণ। এক বিন্দু নড়লো না সাধুজি। কার বাবার সাধ্যি এই হিমালয় পাহাড়কে সরায়। সবারই তখন জান নিকলাবার উপক্রম।

ব্যারিস্টারবাবু ও তাঁর মা অবাক হয়ে দেখছিলেন সাধুজির এই কাণ্ড। সেখানে উপস্থিত ছিল ব্যারিস্টারবাবুর সাত-আট বছরের দুই ছেলে ও মেয়ে, তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ব্যারিস্টারের ভাগনে এবং ভাগনি। এরাও ছিল ঐ শিশু দুটিরই সমবয়সী। শিশুদের চোখে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ঠাকুরমা দিদিমার আঁচলে আধা মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিশু চারটি।

হাসিমুখে বাচ্চাদের দিকে চেয়ে সাধুজি বললেন—আও ইধার। ও লোক সব আদমি নেই।

বাচ্চা কয়টি এগিয়ে এল। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই তাদের চোখে—যেন খেলায় ডাক পড়েছে এবার তাদের।

ছেলে দুটির কাঁধে উঠে বসলেন সাধুজি, আর হাত লাগালেন ঐ মেয়ে দুটির কাঁধে। বললেন—চল্ চল্, হেট্ হেট্।

কোথায় যাবেন বাবা এদের নিয়ে?—বুড়ি মা জিজ্ঞেস করলেন।

সাধুজি বললেন স্নানাহার তাঁকে করতে হবে। আহারের আগে তাঁর স্নান সারতে হবে তো। গঙ্গাস্নানটা তাই সেরে আসতে যাচ্ছেন তিনি।

পিছনে পিছনে চললেন মাতা-পুত্র। চোখে তাঁদের ভয়মিশ্রিত বিস্ময়! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

শিশুদের কাঁধে উঠে চলেছে ঐ বিরাট ঐরাবত। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্যে এলাহাবাদের রাস্তায় বহু লোকের ভিড় জমে গেছে। শিশুরা যেন একটা পাখির পালক কাঁধে নিয়ে চলেছে, আর তাই দেখতে দেখতে পিছু পিছু চলেছে জনতার মিছিল।

ঠিক গঙ্গার ধারে যখন, তখন ব্যারিস্টারবাবু আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন—শিশুদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন বাবা! বাঁচান আমাদের।

সাধুজির ভ্রূক্ষেপ নেই। মাতা-পুত্রকে বাঁচাবার কোনই আগ্রহ নেই তাঁর।

বাচ্চাদের বললেন—এই চল্ চল্, হেট্ হেট্।

এমন মজার খেলা আর কোনদিন খেলে নি বাচ্চারা। যন্ত্রচালিতবৎ তারা চলেছে মাঝগঙ্গার দিকে।

ব্যারিস্টারবাবুর আবার আর্তনাদ। মায়ের চোখে অশ্রুধারা। কী সর্বনাশ হল বুঝি এবার!

মাঝগঙ্গায় শিশুদের কাঁধ থেকে হঠাৎ ঝুপ্ করে নেমে পড়ে সাধুজি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদেই সাধুজি আবার জল থেকে উঠে বাচ্চাদের কাঁধে তেমনি করে চেপে আদেশ করলেন—চল্ চল্, হেট্ হেট্।

অর্থাৎ এবার ঘরে ফেরবার পালা। মাতা-পুত্র যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। আশ্চর্য! দেখা গেল বাচ্চাদের হাঁটু পর্যন্তও জল লাগে নি অথচ তারা গিয়েছিল মাঝগঙ্গায়!

জনতার মিছিল আবার চলল ঐ বাচ্চাদের কাঁধে-বসা সাধুজির পিছু পিছু। এমন অদ্ভুত দৃশ্য কে কবে দেখেছে। ম্যাজিকের ফক্কিকারি, নয় তো এ দৃশ্য। সবাই যে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে, অথচ সবারই ধারণার অতীত এই আশ্চর্য অঘটন।

সাধুজি ফিরে এলেন আবার গৃহস্বামীর প্রাসাদে।

গৃহস্বামী, তাঁর মা এবং বাড়ির অন্যান্য সকলে শিশুদের ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সবার চোখেমুখে তখন কী আনন্দের ছাপ—যেন যমালয় থেকে ফিরে পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের বাচ্চাগুলোকে!

হ্যাঁরে, ভয় করে নি তোদের?—জিজ্ঞেস করলে বাড়ির লোক।

নাঃ কিচ্ছু না। কি মজার খেলা!—বাচ্চাদের আনন্দ আর ধরে না।

বুড়ি মা আবার সাধুজিকে শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, স্নান তো সারা হয়েছে, এবার তাহলে আহারের ব্যবস্থা করি?

সাধুজি হাসিমুখে সায় দিলেন।

একটি প্রকাণ্ড ঘরে গালিচার উপর আসন পাতা ছিল। বুড়ি মা সাধুবাবাকে ঘরখানি দেখিয়ে বললেন—আসুন বাবা। আজ আমার কী সৌভাগ্য!

সাধুবাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু বুড়ি মার সঙ্গে বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ এবং বাচ্চারাও ঢুকল গিয়ে ঘরের ভেতর। সবাই একে একে সাধুবাবাকে প্রণাম করে উঠতেই বুড়ি মা অনুমতি চাইলেন সাধুবাবার কাছে—এবার তাহলে নিয়ে আসি বাবা, আপনার খাবার?

সাধুবাবা বললেন তথাস্তু। সবাইকে ঘর থেকে তখন বার হয়ে যেতে বললেন এবং যাবার সময় যেন দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়া হয় এ কথাও বললেন বুড়ি মাকে।

কিছুক্ষণ বাদেই বুড়ি মা নানাবিধ আহার্য একটি থালায় সাজিয়ে নিয়ে সাধুবাবার ঘরের দরজায় এসে একজনকে দরজাটি খুলে দিতে বললেন। দরজাটি খোলা হলে দেখা গেল ভোঁ ভোঁ। কোথাও কেউ নেই। পাখি উড়ে গেছে!

সবার চোখে বিস্ময়! এমন অঘটনও ঘটে! এমনি কাণ্ড করতেন এই সাধুবাবা!

বরদাবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। উপস্থিত সকলের চোখেই তখন এই উৎসুক জিজ্ঞাসা—সাধুবাবা তবে বুড়ি মার আতিথ্য গ্রহণ করলেন কেন? এবং করেই বা কোন আহার্য গ্রহণ না করে এমনভাবে অন্তর্ধান করলেন কিসের কারণে?

নজরুলের দিকে একবার চেয়ে বরদাবাবু বললেন—কি ভায়া, তোমার কি মনে হয়?

বরদাবাবুর প্রশ্নে কাজি ভায়া কোন উত্তর দিল না, হাসিতে খুশির ভাব ফুটিয়ে দাদার মুখপানে শুধু চেয়ে রইল।

বরদাবাবু তখন বললেন—দেখ, এসব ব্যাপারের অর্থ সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। মনে হবে সবটাই হেঁয়ালি। কিন্তু হেঁয়ালি নয়, এরও তাৎপর্য আছে। সাধুবাবা বুড়ি মার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই এবং আতিথ্যের প্রতিদানও তিনি দিয়ে গেছেন। বাহ্যত তিনি কোন আহার্য গ্রহণ না করেই বুড়ি মার আলয় থেকে অন্তর্হিত হলেন বটে, কিন্তু দিয়ে গেলেন বুড়ি মাকে নীরবে তাঁর বীজ মন্ত্র। বুড়ি মা নিরাশ হন নি, তিনি পেয়েছিলেন পরম পরিতৃপ্তি। সাধুবাবা এইভাবে আসা-যাওয়া করতেন কখনও স্থূলদেহে, কখনও বা সূক্ষ্ম শরীরে এবং যাকে যা দেবার তা তিনি দিতেন এইভাবে। ঊর্দ্ধলোকে উঠবার স্পৃহা যাদের প্রবল হয়েছে তাদেরই কাছে এ সবের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

বরদাবাবু বলে গেলেন, ঐ বিরাট মহাপুরুষ কে জান? উনি ছিলেন এর আগেকার দেহে 'লালা বাবা' বলে পরিচিত। মোগলদের আমল তখন। পিতা সাজাহানকে বন্দী করে ঔরঙ্গজেব যখন সিংহাসন দখল করে শাহেন-শা-বাদশাহ হবার চেষ্টা করছেন সেই সময়কার কথা। আগ্রার যমুনার এধারে এই বন্দিশালা যেখান থেকে যমুনার অপর পারে প্রিয়তমা প্রেয়সী মমতাজের কবরের পানে চেয়ে থাকতেন। এই বন্দিশালাতেই ভারতসম্রাট তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

ঔরঙ্গজেবের সহোদর দারা-সিকোর সিংহাসন পাওয়ার কথা। দারা-সিকো ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং একজন বিশিষ্ট কবি। সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি অভিজ্ঞ

ছিলেন। সর্বসাধারণ তাঁকে ধর্মপ্রাণ বলেও অশেষ শ্রদ্ধা করত। হিন্দু যোগী লালা বাবার খ্যাতির কথা শুনে দারা তাঁরই কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঔরংজেব দারাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে তাঁর সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার করেন। এ সবই তো ইতিহাসের কথা। যাই হক, দারার গুরু লালা বাবা বহুকাল তাঁর এই দেহটি ধরে রেখেছিলেন—কয়েক শ' বছর।

তারপর যুক্তপ্রদেশের এক ক্ষত্রিয় সামন্তের মৃত পুত্রের দেহ আশ্রয় করে আজন্ম সংসারবিরাগী হয়ে এই মরজগতেই বিরাজ করছেন এখনও। বর্তমান জীবনে তিনিই হলেন সরকারজি, বুঝলে ভায়া। জন্মান্তরে আবার কী খেলা খেলবেন, তিনিই জানেন।

৫

বেঁটে বামুনের গেঁটে বাত ছিল। দুপায়ের হাঁটুতে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাতের লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়ে দাদা বললেন—বল্ দুটো ভাল কথা বল্।

মুখটা গম্ভীর। জীবনটাকে সব অবস্থায় যিনি হাস্যরসে আনন্দঘন করে তুলতে অভ্যস্ত তাঁর এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে বিস্মিত হলাম। বেলা তখন চারটা বাজে নি। মাত্র তিন চারজন বন্ধু হাজির হয়েছিল। দাদা বুঝি অফিসের পলাতক। ব্যাপারটা কি? দাদা কি তবে পরকালের চিন্তায় আকুল হয়েছেন?

আমার প্রশ্নের আগেই দাদা বলে উঠলেন—হাজার বছর আগে আমি যা ছিলাম, হাজার বছর পরেও হয় তো সেই আমিই থেকে যাব; কথাটার অর্থ কি বলতে পারিস্।

আমার মত অর্বাচীনের সঙ্গে এই গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার প্রয়োজন তাঁর কিছুই ছিল না, তবু এই উত্থানি কেন? একটা হেতু নিশ্চয়ই আছে। তারই সূত্র ধরবার আশায় সাহস সঞ্চয় করে চটপট বলে গেলাম—সমুদ্রের জল যেখানেই গড়াক না কেন, ফিরে তা সমুদ্রেই আসে যে।

সমুদ্র-টমুদ্র অনেক দূর। গোষ্পদ নিয়ে কারবার। এর জল গড়াবার রাস্তা পায় না, তাপে শুকায়। অতঃ কিম্?—দাদা জিজ্ঞাসা করেন।

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। ক্ষুরধার যাঁর বুদ্ধি, অসাধারণ বাকচাতুর্য আর

তর্কের জটিল জাল ভেদ করে যার যুক্তি হয়ে ওঠে প্রোজ্জ্বল। তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের বুকনি দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা আমার ছিল না। আমার চেষ্টা ছিল এই তীক্ষ্ণধী লোকটাকে হাস্যরসের তারল্যে গলিয়ে দিয়ে অতঃপর এই পিপাসার্ত জীবনের জন্য কিছু পানীয় সংগ্রহ করা।

বাতুলতা হলেও সেটা ছিল আমার উদ্দেশ্যমূলক। তাই দাদার কাছে মাসির পরিচয় দিতে আমার বাধে নি। কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথি-মুখনিঃসৃত বাণীর দুটি কলি ঠিক তোতাপাখির মত কপচে গেলাম—

> ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
> ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌॥

দাদা এবার মৃদু হেসে আমায় বললেন—ও ত ধার করা বুলি কপচালে চাঁদ! নিজের মধ্যে ঐ বুলির সার্থকতা কিছু খুঁজে পেয়েছ কি যাতে ওটা সত্য বলে মেনে নিতে পার?

কিন্তু বিশ্বাস করি, আর এই বিশ্বাসটা এসেছে বহু যুগ-যুগান্তের সংস্কার থেকে। যাঁরা সত্যদ্রষ্টা, সত্যকে কোন্‌ পথে গেলে দেখা যায় তারও হদিস দিয়ে গেছেন। আমার শুধু বিশ্বাস থাকলেই তো হবে না, সত্যকে জানবার আস্পৃহা কই?

আস্পৃহা? আস্পৃহার গোড়ায়ও যে রস চাই। সেই রস সংগ্রহ করতে করতেই যে প্রাণান্ত হয়ে যায় ভাই। ভূধর-খেচর-চরাচরের স্রষ্টা ও নিয়ামক বলে যিনি আখ্যাত তাঁকে আবিষ্কারের আগে আমাদের এই উদর নামক বস্তুটি যে দিবারাত্রি বাপান্ত করতে থাকে কিনা, তাই আস্পৃহা লতাটি গজিয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। স্রষ্টা দ্রষ্টা প্রভৃতি ভাল ভাল কথা রাখ। মোদ্দা, অখণ্ডিতের প্রতি লোভ আমারও নেই এবং তোমারও তার জন্যে জিহ্বা লকলক করছে তা তো মনে হয় না।

বুঝলাম দাদা এবার ধাতস্থ হয়েছেন।

বাতগ্রস্ত পায়ের হাঁটু দুটোকে জোরে দুবার ঝাঁকুনি দিয়ে দাদা যেন প্রত্যয়ের সুরেই বললেন—ভাখ, মানুষের দেহান্ত হলে শ্মশানের দুমুঠো ছাই-ই সম্বল, তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কিছুদিন থেকে পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্র পড়ে এই কথাই ধরে নিয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ কে যেন আমার সঙ্গে বেয়াড়াপনা করে গেল, তাই মাথাটা গেছে গুলিয়ে। শোন্‌ তবে বলি।

শুরু করলেন দাদা অতঃপর—ভাই রে, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। সকাল-

বেলার সবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক মেরেছি। দেখি অধমের বাড়িতে গণ্ডাখানেক ভদ্রলোক এসে হাজির। কি ব্যাপার? কোথা হতে আগমন? আসছেন তাঁরা ধনেখালি থেকে—ধনেখালি, আরে হুগলি জেলার ধনেখালি রে। কিবা প্রয়োজন? চাকরির উমেদারি নিশ্চয়ই নয়, তাহলে এতগুলো লোকের একসঙ্গে শুভাগমন হত না। তবে কি বারোয়ারি পুজো না কোন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সাহায্যের জন্য চাঁদা? মুখটা চট করে যথাসম্ভব গম্ভীর করে ফেললুম।

তাঁদের মুখপাত্রটি বললেন—বসুন আপনি, নিতান্ত দায়ে ঠেকে এসেছি আপনার কাছে।

এই রে—দায়! যা ভেবেছি তাই।

বলা বাহুল্য, আমি দাঁড়িয়েই ছিলুম, বসবার তাড়া আমার ছিল না। এইবার মুখখানা আরও হাঁড়িপানা করে কঠোর হবার চেষ্টা করছিলুম, লোকটি বোধ হয় কি অনুমান করে নিয়ে বিশ্রী কিছু একটা ঘটবার আগেই অতি শান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনার কাছে আমরা এসেছি কোন বিশেষ ব্যাপারে আপনার অনুমতি চাইতে, দয়া করে শুধু অনুমতি দেবেন এইটুকুই ভিক্ষা; দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন না আপনি, বলছি তারপর।

শুধু অনুমতি! এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলুম। দেখি লোকগুলো আমার বিনা অনুমতিতেই দিব্যি ফরাসের উপর বসে পড়েছেন। এখন আসল অনুমতির অপেক্ষা।

অজ্ঞাতকুলশীল সব। তবু আমার অনুমতি ভিক্ষা করতে এসেছেন দায়ে ঠেকে—এটা সম্পূর্ণ রহস্যজনক হলেও বিপদের কোন আশঙ্কা নেই জেনেই সহাস্যবদনে দন্তবিচ্ছেদ করে ফেললুম এবং আসনও পরিগ্রহ করলুম।

তারপর?

তারপর সেই আগন্তুক মুখপাত্রটি বললেন, তাঁদের বাড়িতে বহুদিনের পুরান এক মন্দির আছে, আর সেই মন্দিরে আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। মন্দিরটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর দুশো বছর কেটে গেছে। সম্প্রতি মন্দিরের ভগ্নাবস্থা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই নাকি এটা ঘটেছে। এখন স্থির হয়েছে পুরান মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে তার স্থলে এক নতুন মন্দির নির্মাণ করে তাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে ঐ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ।

কিন্তু ইতিমধ্যে হয়েছে নাকি এক বাধা। মুখুজ্জে বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকে এক বাগদির মেয়ে। এই মেয়েটির উপর নাকি মাঝে মাঝে 'ভর' হয়।

ভূতের ভয় তো বুঝিস? এ কিন্তু ভূত নয়, ভূতের চাইতে জাতে হয়তো বড় একটা কিছু। সাধুভাষায় যাকে সমাধি বলে যে, তারই একটা রকমফের বোধ হয়। এই অবস্থার সময় মেয়েটির মুখ দিয়ে নাকি আশ্চর্যরকমের অনেক সত্য গল গল করে বেরিয়ে পড়ে। এই মেয়েটিই বলেছে যে, ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলুম নাকি আমিই। সুতরাং আমার বিনা অনুমতিতে ঐখানে নতুন মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা চলবে না। অতএব আমাকে দয়া করে অনুমতি দিতে হবে।

আমা হেন ব্যক্তিকে আবিষ্কার করতে পাছে কোন ভুল হয়, এজন্যে মেয়েটি আমার নাম ধাম, ধামের নম্বর এবং সে ধামে পৌছতে হলে কোন্ রাস্তা ধরে কিভাবে যেতে হবে তা পর্যন্ত নাকি বাৎলে দিয়েছে।

ভদ্রলোকটি তদনুযায়ী একখানি ম্যাপ এঁকে এনেছেন, আমায় দেখালেন। বিস্মিত হলুম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলুম, এই নরাধম একেবারে মার্কামারা, পরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এ-সব সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু তাই বা কেন? কিসের স্বার্থ এদের? আপাতত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

নিতান্ত গঞ্জিকা বলে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। বিনা পয়সায় অনুমতিটা তাই তাই দিয়ে ফেললুম।

তারপর লোকটি কোন এক নির্দিষ্ট দিনে আমায় রাধাকৃষ্ণের পুজো দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন। এই রে! বাক্যব্যয় করবার আগেই ভদ্রলোক পুজোর উপকরণাদির একটা লিস্টি এবং সেই সঙ্গে পাঁচটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আমায় হতবাক করে দিলেন।

নিঃসঙ্কোচে এবারও তাই দয়া দেখাবার আশ্বাস দিয়ে ফেললুম।

কিন্তু পোড়া মনের সন্দেহ তবু কি যায়? ভেকি দেখিয়ে আমার সঙ্গে সব ইয়ার্কি মেরে যাচ্ছে না ত? টুপ করে একবার বাড়ির ভিতরে গিয়ে মধ্যম নন্দন রাজেনকে গিয়ে বললুম যা তো বাবা, সাইকেলখানা নিয়ে একবার বাইরে। জানলায় ফাঁক দিয়ে তাকে একবার লোকগুলোকে চিনিয়ে দিলুম। বললুম সিঁথির মোড়ে এঁরা নিশ্চয়ই বাসে উঠবেন। তুই চিড়িয়ার মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে ফিরতে মাঝপথে এঁদের ধরে ফেলবি এবং এঁরা কোথাকার লোক এদিকে কি হেতু আগমন, উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি বেশ কায়দা করে জেনে নিয়ে দে দেখি একটা রিপোর্ট, দেখি কেমন বাপের বেটা।

বাপের বেটা ফিরে এসে যা রিপোর্ট দিলে তাতে আর সন্দেহের তিলমাত্র নেই। লোকগুলির কোন দুরভিসন্ধিই ধরা পড়ে নি, উপরন্তু তাঁদের সরল ভাষণে আমার সঙ্গে যাবতীয় কথায় হুবহু পুনরুক্তি পেলুম। তাঁরা নাকি ধন্য হয়ে গেছেন।

যাবার সময় ভক্তিভরে আমার পায়ের ধুলোও নিতে ভোলেন নি তাঁরা।

বামনির হাতে টাকা পাঁচটা ফেলে দিয়ে পুজোর ভার তাঁরই উপর দিয়ে দিয়েছি। তাঁর স্বনাম এবং বেনামধন্য স্বামীপুরুষের দায় তিনিই সেরে দেবেন বলেছেন হাসিমুখে।

মুখুজ্যে সন্তান কি করে উত্তরকালে বাঁড়ুজ্যে বংশে ঘোর শাক্ত হয়ে পুনরায় জন্মালুম তাই ভাবছি। ইতিমধ্যে আরও দুতিনটে জন্ম হয়তো পার হয়ে এসেছি, নইলে দুশো বছর কাটে কি করে?

গল্পটি শেষ করে দাদা একটা টানা নিশ্বাস ছেড়ে বলে গেলেন—কিন্তু তা তো হল। সবটাই যেন কি রকম অন্ধকারে ঘটে যাচ্ছে। একটানা এই ভূতের বোঝা আর কতকাল বইব বল্? রামপ্রসাদের মত তাই কাঁদতে ইচ্ছে করে—

মা, আমায় ঘুরাবি কত
(কলুর) চোখ-ঢাকা বলদের মত?

অন্ধকারেই তো আমরা পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি দাদা, যাঁরা আলোকের পথ দেখিয়ে দেন, আমরা সে পথে কি পা বাড়াবার চেষ্টা করি? আমি এবার বুড়ি ছুঁয়ে দিলাম। বললাম, কেন কর্তা কি বলেন?

কর্তা মানে শ্রীঅরবিন্দ। এইখানে দাদার ছিল দুর্বলতা। দুর্বার অনর্গলতা যেন অকস্মাৎ হয়ে যেত স্তব্ধ। তিনি বলতেন দুজ্ঞেয় বিধাতাপুরুষের মতই নাকি এই লোকটি অনন্ত, অপার, অতল! কম্পাসের কাঁটার মত লোকটির দৃষ্টি থাকে মনেরও উপরে কি যেন আছে একটা অতিমানসলোক সেইখানে। বুদ্ধি দিয়ে তার ছাটটা হয়তো আঁচ করা যায়, কিন্তু উপলব্ধিতে আসে কই?

কর্তা বলেন—

মৃত্যু ঘটবেই, কেন না দেহাশ্রিত আত্মার পক্ষে ঐ একই, দেহ ক্রমোন্নতির পথে সহায়ক না হলে হবে দেহান্ত। শুধু প্রাণ, মন নয়, দেহেরও যে চাই সচেতনতা; এরা সব যথেষ্ট সচেতন হলে দেহান্তের প্রয়োজন হত না।

… … …

অতিমানস সত্তায় না উঠলে দেহের অমরত্বের কথা উঠতে পারে না। সে

সম্ভাবনা আছে যোগশক্তিতে এবং কেবল যোগীরাই পারে দুশো তিনশো বছর কিংবা তারও চেয়ে দীর্ঘকাল ধরে দেহ ধারণ করতে। কিন্তু অতিমানসের উপলব্ধি ছাড়া সেরূপ কোন নীতি তো থাকতে পারে না।

এমন কি জড়বিজ্ঞানীদেরও বিশ্বাস তাঁরা মৃত্যুকে একদিন করবেন জয় স্থূল উপায়ে এবং তাঁদের এই বিশ্বাসের অনুকূলে যুক্তিও বেশ সুসঙ্গত। তবে অতিমানস শক্তির দ্বারাই বা তা হবে না কেন ?...

মৃত্যুর ওপারে কি ঘটে সে বিষয়েও র্কতার যোগলব্ধ তত্ত্বের উল্লেখ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু থাক সে কথা !

মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল এই যে মৃত্যুকে রোধ করে মানুষ দীর্ঘায়ু হতে পারে যোগশক্তির দ্বারা আর দেহান্ত হলে দেহান্তর গ্রহণের প্রয়োজন আত্মারই বিকাশের জন্যে। এই দেহান্তর তত্ত্ব জড়বিজ্ঞানীরাও মেনে নিয়েছেন তাঁদের বিবর্তনবাদে। পার্থক্য এই—বিজ্ঞানীরা আত্মার বিকাশ দেখেন স্থূলের ভিতরে আর যোগীরা যান স্থূলকে ছাড়িয়ে সূক্ষ্মে।

দাদা যে এ তত্ত্ব জানেন না বা মানেন না তা নয়। স্বর্গ, অপবর্গ, আত্মা পরলোক সব বাজে কথা ; পেট ভরে খাও আর মহানন্দে বাঁশি বাজাও। কারণ একবার অক্কা পেয়ে গেলে ল্যাংড়া আমও মিলবে না, বাগবাজারের রসগোল্লাও জুটবে না। সুতরাং যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। মুখে তিনি একথা বললেও তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় একটা জিজ্ঞাসা। পেটের জ্বালা জুড়াতেই কখন যে মনটা বেঁকে বসে তার স্থিরতা নেই। শ্যামের পেছনে ধাওয়া করলে কুল থাকে না ; আবার কুলের মান রাখতে গেলে শ্যামের বাঁশি শোনা যায় না। যে প্রেয়সীর বিলোল কটাক্ষ একদিন প্রাণে হিল্লোল তুলত জামাইষষ্ঠীর ফর্দ দেখে তার খুঁত-খুঁতানি শুনলে মনে হয় তার গালে দুই চড় কষিয়ে দিই ; যে দুধের শিশুর কচি কোমল মুখের হাসি দেখে হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে তাকেই হয় তো বুকে করে নিয়ে একদিন শ্মশানে গিয়ে ছাই করে আসতে হবে। এইসব জ্বালা জুড়াবার তবে স্থান কোথায় ?

অতঃপর আসে অনুসন্ধিৎসা যা সত্যকে আবিষ্কার করতে চায় অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করে। মৃত্যুর ওপারে যে অন্ধকার তার দিকে না চেয়ে মৃত্যুর এপারে যে আলোক তার দিকেই চোখ মেলে চাইবার আগ্রহ দাদার অসীম। জীবনটা মৃত্যুর পথ ধরে চললেও একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে চলেছে এবং তা এক পূর্ণ রূপকে মূর্ত করে ধরবার জন্যে। পঞ্চভূত রূপান্তরিত

হয়ে বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে; প্রাণ জীবশরীরে রূপান্তরিত হয়ে মনের আসনে বসেছে; মনুষ্যশরীরে মন ও বুদ্ধির মধ্যে অহংসত্তা স্ফূর্ত। অহংসত্তা থেকে ভেদের উৎপত্তি বলে মানুষ আপনাকে খণ্ডিত করে নিরানন্দময় হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির ক্রমবিকাশলীলা শেষ হয়ে যায় নি। ভেদবুদ্ধি জর্জরিত জীব আজ আপনার ক্ষুদ্রতায় পীড়িত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। প্রকৃতির এটা হল প্রসব-বেদনা। অহং যে মনাতীত সত্তার খণ্ডিত বহিঃরূপ মাত্র। মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে সেই সত্তার আত্মপ্রকাশের সময় সমুপস্থিত। নর এবার আপনার খণ্ড রূপকে অতিক্রম করে নারায়ণকে আপনার মধ্যে মূর্ত করে তুলবে। সেই অবস্থা লাভ করবার চেষ্টার নামই যোগসাধন আর মানুষের উন্নতির ভিত্তিই হল তাই।

কিন্তু এই সাধনার জন্যে যে আস্পৃহা, অসীম ধৈর্য ও প্রশান্তির প্রয়োজন তা দাদার চিত্তে স্ফুটতর হয়ে ওঠে না বলেই তার দুঃখ। এইটাই তাঁর মনবেদনার আসল কারণ আর এই কারণেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃত যা, তাকে আঘাত হানার ভাব করা। এ জীবনেই যদি নরের মধ্যে নারায়ণকে টেনে আনা না গেল তবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁকে নিয়ে টানাটানি করবার স্পৃহা তাঁর নেই। এবং সেই জন্যেই না তিনি পণ্ডিচেরির ইস্কুলের পলাতক ছাত্র!

একটা সহজ ফরমুলা কর্তার কাছে আশা করেছিলুম রে! কিন্তু তা এই পোড়াকপালে জুটল না, কর্তা কোন ভরসাই দিলেন না।

দাদার হাসিতে বেদনা ফুটেছে দেখলাম।

তারপর গলার স্বর প্রায় অস্ফুট করে দাদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কর্তার ফ্যাক্টরিতে কটা দেবশিশুর জন্ম হয়েছে বলতে পারিস্?

ব্যঙ্গ নয়, এ প্রশ্ন ছিল বেদনাজড়িত।

সর্বশেষে তিনি বললেন—সোজা কথা বলি ভাই, দিন আমার ফুরিয়ে এল। নারায়ণ এখনও ক্ষীরসমুদ্রে চিৎপাটন হয়ে পড়ে আছেন, কর্তার কথা তাঁর কানে বাজছে না। জন্মজন্মান্তরের জের টানার ধৈর্য আমার নেই। আবার যদি এই মরজগতে আসতেই হয় তবে চীৎকার করে নারায়ণের ঘুম ভাঙিয়ে বলব—দোহাই ঠাকুর, প্রেমের উপাসক করে আমায় আর পাঠিও না, বরং হাতে দিও একটা ভীমের গদা; যারা এখনও তোমার সঙ্গে শয়তানি করছে আর একটা কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে তাদের সবাইকে ঠেঙিয়ে সায়েস্তা করে এই ধরাধামে তোমার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেব।

বাবার জন্মান্তরের কাহিনী যখন শুনছিলাম তখন জাতিস্মরদের জীবনের এমন কত কাহিনীর দৃষ্টান্তও মনে পড়েছিল। ভগবানের সৃষ্ট জগতে অনন্ত রহস্য, অনন্ত তাদের বৈচিত্র্য। আমাদের জ্ঞানের সীমায় কতটুকু এসে ধরা দেয়!

দুশো বছর আগে যিনি ছিলেন প্রেমের উপাসক, দুশো বছর পরে তিনিই দুর্দ্ধর্ষরূপে হাতে নিলেন মারাত্মক বোমা!

এই ব্যক্তিটি আর কেউ নন, ইনি হচ্ছেন আমাদের অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গীয়-উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে আমাদের সবাকার উপেনদা।

৬

কালাপানির ঘানি-টানা হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল যখন মুক্ত হয়ে ফিরে এলেন তখন তিনি আমাদের কাছে ঋষিদা। এই ঋষিদাকে একদিন আমি অকালে মেরে ফেলে 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিলাম। পরে অবশ্য জানা গেল যে, তিনি যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে এই জরা-মৃত্যু-জর্জরিত ধরাধামে তখনও দেহ ধারণ করে আছেন এবং ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রাম্যমান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সেই ঋষিদা দেখি একদিন আর্য পাবলিশিং হাউসের দরজায় হাজির! গায়ে গেরুয়ার সুদীর্ঘ আলখেল্লা, মাথায় গেরুয়ার প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে মোটা একগাছি লাঠি। সেই ভরাট মুখমণ্ডলে আধ নিমীলিত দুটি চোখের দৃষ্টি আমার দিকে ফেলে মুচকি মুচকি হাসছেন। কী বালসুলভ সুন্দর হাসি তাঁর পাতলা দুখানি ঠোঁটে জড়িয়ে আছে!

আনন্দে বিগলিত হয়ে চীৎকার করে ডাক দিলাম—ঋষিদা!

আমার ডাক শুনতেই দাঁতে জিব কেটে ঠোঁটে তর্জনী স্পর্শ করে চুপি চুপি বললেন—এই ঋষিদা আর বলিস নি, আমি এখন বিশুদ্ধানন্দ গিরি। তোদের এই দোকানের পরে একখানা দোকান ছাড়িয়ে ঐ যে বাইওকেমিক ওষুধের দোকান, তার মালিক আমার শিষ্য, ঐখানেই যাব বলে এসেছি; তার আগে তোর এখানেই উঠলুম। খবরদার, আর কখনও ভুলেও যেন ঐ শিষ্যের সামনে আমাকে ঋষিদা বলে ডাকিস নি, তাহলে ভক্তির মাত্রা একেবারে জিরো ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকবে রে!

বলতে বলতেই শিষ্যটি এসে হাজির। বোধহয় তিনি গুরুদেবকে দেখতে

পেয়েছিলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেব বললেন তিনি আমাদের এখানে ঘণ্টা দুই কাটাবেন, তারপর যাবেন শিষ্যের ওখানে। বাঁচা গেল। ঋষিদা বাইরের খোলসটা ফেলে দু দণ্ড প্রাণ খুলে কথা বলে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দ দিতে পারবেন।

হাঁ রে, এই ভদ্রমহিলাকে চিনিস্?—বলে ঋষিদা তাঁর গেরুয়ার ঝুলি থেকে একখানা কবিতার বই বার করে আমার হাতে দিলেন। লেখিকার নাম গিরিবালা দেবী।

বললাম—না তো; এঁকে চিনি না, আগে এঁর কবিতা পড়েছি বলেও তো মনে পড়ছে না।

তাহলে একটু পড়েই ত্থাখ্ না কেমন লেখেন উনি।

বললাম মন্দ নয়। মিষ্টি হাতের ছাপ আছে।

তাহলে এই মহিলা কবির যাতে ইষ্টি হয় তাই কর্ না। রেখে দে এখানে খান দশেক যদি কিছু কাটে, ঘরে রাখলে যে পোকায় কাটে।

তাতে আপনার স্বার্থ কি ঋষিদা?

টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঋষিদা বললেন—অনেকদিন একসঙ্গে ঘর করেছি কিনা, তাই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চাই। ত্থাখ্ একটু চেষ্টা করে। হয়ত ইহলোকে থেকেই পরলোকের আশীর্বাদ পেয়ে যাবি।

বৌদিকে চোখেও দেখি নি কোনদিন, তাঁর নামও এতদিন শুনি নি কারও কাছে। তিনি যে কবি ছিলেন তা আজ জানতে পারলাম ঋষিদার কল্যাণে।

ঋষিদা সংসার পেতেছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রকে দেখেছিলাম সাবালক অবস্থায়। কিন্তু ঘর থাকতেও কতদিন পর হয়ে ছিলেন তার হিসাব দেওয়া কঠিন।

বললেন ঋষিদা—বেশ ছিলুম রে, মাসখানেক ময়মনসিং-এর এক জমিদার বাড়িতে। জানিস্ তো আমি একটা পেটুক লোক। সেখানে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সে কী অফুরন্ত আয়োজন। তোফা খেতুম আর খাওয়ার পরই সুস্নিগ্ধ ডাবের জলে পেটটা শীতল হয়ে যেত। প্রাসাদতুল্য বাড়ির চারিদিকে অগণিত নারিকেল গাছ। যাবি ত বল্। গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না। আমারই কি ইচ্ছে ছিল? শেষটায় পেটের অসুখ হয়ে গেল ভাই, তবু হয় ত থাকতুম আরও কিছুকাল, কিন্তু বিধি বৈরী। গোপালকে চিনিস্ তো? আরে ঐ দর্জিপাড়ার গোপলা। কোথা থেকে খবর পেয়ে ছুটেছে সেই ময়মনসিং শহরে।

কি ব্যাপার ? বললে, সে এক জটিল ব্যাপার আমাকে ফিরতে হবে কলকাতায়। তাই ফিরেছি তাই এই কদিন হল, কিন্তু জটিল ব্যাপারের সমাধানই করতে পারছি না রে। বলি শোন্—

গোপলার একমাত্র বোন মেখলার খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিল সে। মেয়ে খাসা দেখতে। বাংলাদেশে বামুনের ঘরের অবস্থা বুঝতেই পারিস্। চাল-কলাই যাদের বেশির ভাগ সম্বল তারা আবার ঘটা করবে কি ? তবু ওরই মধ্যে গোপলা যা করেছিল তাকে ঘটাই বলা যায়। কিন্তু হল কি, বিয়ের পাঁচ-ছয়মাস পরে জানা গেল মেয়েটির সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সে নাকি জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। শুধু তাই নয় রে। বার চারেক ঐ পাষণ্ড বিয়ে করেছে এমনি করে নাম ভাঁড়িয়ে। আহা, উঠতি বয়সের অমন সোনার চাঁদ মেয়ের কী দুরবস্থা বল্। মেয়েটির ভবিষ্যৎ তৈরির পন্থা কি তা-ই বাৎলে দেওয়ার ভার পড়েছে আমার ওপর।

এ সমস্যার সমাধান করবে কে ?

দূরে মূগারে।

অতঃপর ঋষিদা ব্রহ্মার চতুর্বর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বের এক নতুন ভাষ্য শুনালেন। সে ভাষ্য শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। শ্লীলতার পর্যায়ে সে ভাষ্য অপাংক্তেয় বলে এখানে তার প্রকাশ সম্ভব নয়।

এমন সময় প্রবোধ সান্যালের প্রবেশ।

ঋষিদা !—আনন্দে উৎফুল্ল প্রবোধের মুখে আবার ঐ ডাক।

বললাম—এই চুপ চুপ—ইনি বিশুদ্ধানন্দ গিরি! চুপ করার কারণটা প্রবোধকে শুনিয়ে দিলাম। সে ঋষিদার কাছে ঘন হয়ে বসল।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মার চতুর্বর্ণ সৃষ্টিতত্ত্বের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা ঋষিদার মুখে শুনেছি তা-ও শুনিয়ে দিলাম প্রবোধকে। আবার একচোট অট্টহাস্য! সে হাসির বেগ যেন আর থামতে চায় না।

এবার ঋষিদা তাঁর মুখখানা গম্ভীর করে তাতে বিষাদের ছায়া ফুটিয়ে তুললেন। একটা দীর্ঘশ্বাসের ব্যর্থতা যেন উদ্বেগ হয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়ল। বললেন—কত দেশই না ঘুরলাম ভাই, ঘর আর বাহির, বাহির আর ঘর। শান্তি খুঁজে পাই নি কোথাও। মনটা যেন টাট্টু ঘোড়া, ছুটে চলতে চায়, বাগ মানে না কিছুতেই। সর্ব বাহ্যবস্তু থেকে মনটাকে সরিয়ে এনে নিশ্চল নীরবতার মধ্যে তাকে ধরে রাখতে পারলে নাকি এই দুর্লভ বস্তুকে লাভ করা যায়। তখন ঋগ্বেদের ঋষির মতই এই সমগ্র বিশ্বচরাচরকে মনে হয় 'মধুবৎ মধুময়'—

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

হাজার হাজার বছর আগে চল্ যাই চলে। কি দেখি তখন? দেখি কেউ উঠেছে মনের দিক দিয়ে অনেক উচুতে আবার কেউ নেমেছে একেবারে রসাতলে। অর্থাৎ দ্বৈতলীলা না হলে বোধ হয় সৃষ্টির রস মাধুর্য ভোগ করা যায় না, তাই ভগবান মানুষের সঙ্গে খুনসুড়ি করে আরাম পান। তখন যে ছবি দেখেছি পট পরিবর্তনের পর সেই একই ছবি এখনও চোখে পড়ছে। ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা—এটাই চলছে নিরন্তর। সব গুলিয়ে যায়, তাই।

বাল্মীকির যুগের কথা বলি শোন্। দণ্ডকারণ্যে ঋষি মাতঙ্গের আশ্রমের অদূরেই থাকত ব্যাধকন্যা শবরী। অতি দীনা হীনা। স্বামী মারা গিয়েছিল অকালে। সন্তানাদি তার কিছুই ছিল না। একা একা থাকত কায়ক্লেশে। গাছের ফল-মূল খেয়েই তার জীবন চলত। ঋষির আশ্রমের কাছাকাছি যাবার তার সাহস ছিল না—পাছে আশ্রমবাসীদের কেউ তার ছায়া মাড়ায়। যদি তার গায়ের বাতাস কারও গায়ে লাগে কিংবা তার ছায়া কেউ মাড়িয়ে ফেলে তবে দর্শকের পবিত্রতা অমনি উবে যাবে কর্পূরের মত। শবরী তাই সব সময় সশঙ্ক, সন্ত্রস্ত।

একদিন শবরী দেখল মাতঙ্গ ঋষি প্রাতঃস্নান সেরে এসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখে শবরী মুগ্ধ হল; কিন্তু অস্পৃশ্য নারী তো, তাই সেখান থেকে সে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে বেশ একটু দূরে থেকেই ঋষিকে দেখতে লাগল আর আপন মনে ভাবতে লাগল—কি করে সেবা করব আমি এই ঋষিকে, যাঁকে চোখে দেখা নিষেধ যাঁর কাছে যাবার উপায় নেই আমার, তাঁকে সেবা করা যে আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ভাবতে ভাবতে শবরীর মাথায় খেলে গেল একটা মতলব। অবিশ্যি বিপদ আছে, কিন্তু কী সুন্দর, ভাবতেও মিষ্টি লাগে। সে এমনভাবে ঋষির সেবা করবে যাতে সে তাঁর নজরে না পড়ে এবং তিনি কিছুই টের না পান।

আশ্রমের দরজা থেকে ঋষির নদীতে স্নান করতে যাবার পথটা গভীর নিশীথে শবরী ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে জল ছিটিয়ে দিত আর ঋষির যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করা কাঠ ঠিক আশ্রমের দরজার সামনে রেখে দিত। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন; এমনি করে চলতে লাগল শবরীর কাজ।

পরিচ্ছন্ন রাস্তা আর দরজার সামনে রাখা যজ্ঞের কাঠ কিছুদিন মাতঙ্গ ঋষি লক্ষ্য করছিলেন। বিস্মিত হলেন তিনি। একদিন এক শিষ্যকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—জান তোমরা কেউ এমন সুন্দর করে রাস্তা পরিষ্কার করে কে এই যজ্ঞের কাঠ দরজার সামনে রেখে যায় ?

শিষ্য বললে—না ত, আমরা কেউ জানি না। তবে শুনেছি কোন বনবাসী রাত্রে এ-কাজ করে যায়।

মাতঙ্গ আদেশ দিলেন—যে এ-কাজ করে তাকে জেনে যেন তাঁর কাছে হাজির করা হয়।

শিষ্যটি যথা আজ্ঞা' বলে সেইদিনই রাত্রে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। শবরী যথাসময়ে এসে তার কাজ শুরু করতেই শিষ্যটি তার সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে তুমি ? কেন এই আশ্রমের পরিবেশ রাতের পর রাত পরিষ্কার করে যজ্ঞের কাঠ দরজার সামনে ফেলে যাও ? গুরুদেব আদেশ করেছেন তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে, চল তুমি।

শবরী ভয়ে কাঁপতে লাগল। বুঝি তার অপরাধ ধরা পড়ে গেছে। তবু সে চলল মহর্ষির কাছে।

মহর্ষি এই নারীকে দেখে তার সামনে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—মা কি উদ্দেশ্যে তুমি এই আশ্রমের চারিদিক এমন সুন্দর করে পরিষ্কার করে আমার জন্যে যজ্ঞের কাঠ রেখে যাও দিনের পর দিন ?

ঋষির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণতা হয়ে শবরী বললে—হে মহাত্মা, আমি এই আশ্রমের একটু দূরেই বনে বাস করি। আমি অস্পৃশ্যা। কোন সহায়-সম্বল নেই আমার। একদিন আপনাকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখে আমি উৎফুল্ল হয়ে হয়ে উঠলাম। সেইদিনই আমার মনে বাসনা জাগল আপনাকে সেবা করবার। কিন্তু কিভাবে আপনার সেবা করব ? আমি যে আপনার কাছে যেতে পারি না। তাই সন্দেহ-সংকোচ হতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই আমার মনে হল—কেন, আমি তো এভাবেও আপনার সেবা করতে পারি, যা আমি করে আসছি এ-যাবৎ। অপরাধ হয়ে থাকে আমায় ক্ষমা করুন দেবতা !

মাতঙ্গ ঋষি শবরীর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যকে আদেশ দিলেন—বৎস, আশ্রমের বাইরে শবরীর থাকবার সব ব্যবস্থা করে দাও। আর, প্রতিদিনের আহার্য সে পাবে এই আশ্রম থেকে। এটাই হবে তার আমাকে সেবা করবার পুরস্কার।

শবরী আর একবার ঋষিবরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিবেদন করলে—হে মহানুভব! ক্ষমা করবেন, আপনার এ পুরস্কার আমি গ্রহণ করতে অপারক। বন থেকে আমি যথেষ্ট ফলমূল পাই। পেটের জন্তে আমার কোন ভাবনা নেই। আপনার কৃপা একটু-আধটু পেলেই আমি ধন্ত হব, সেই হবে আমার সত্যিকার পুরস্কার। আমি ঐশ্বর্যের কাঙালিনি নই—কারণ, আমার পরিবার বলতে কিছু নেই। আমার জন্তে শোক করবারও কেউ নেই। শুধু এই আশীর্বাদ করুন যাতে মরণকালে আমি ভগবানের চরণে আশ্রয় পাই।

নিরক্ষরা বনবাসিনী এই অস্পৃশ্যা নারীর কথা শুনে মাতঙ্গ ঋষি বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণের জন্তে তিনি সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি শবরীকে সম্বোধন করে বললেন—ধন্ত নারী, তুমি নির্ভয়েই এই আশ্রমেই থাকবে।

এই আদেশ দিয়ে মাতঙ্গ ঋষি আশ্রমের ভিতরে নিষ্ক্রান্ত হলেন। শবরীও সেইদিন থেকে আশ্রমেরই একজন হয়ে গেল। ঋষির প্রতি শবরীর যে মনোভাব তার তিলমাত্র অন্তথা হল না। বরং তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়তে লাগল, তার নিত্যকার কর্তব্যও তেমনি রইল।

এমনি করে বছরের পর বছর গড়িয়ে যেতে লাগল। দণ্ডকারণ্যে কত লোক মাতঙ্গ ঋষিকে অনুরোধ করতে লাগল শবরীকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দিতে, কারণ তা না হলে নাকি ঋষির তপস্তার ব্যাঘাত হবে। আশ্রমবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ শবরীর সঙ্গে বাক্যালাপ করত না, কেউ বা তার সামনে আহার্য গ্রহণ করত না। মহর্ষি এ সব জেনে সকলকে তিরস্কার করলেন। এর পরেও শবরীকে আরও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল।

এমনি করে আবার কত বছর গড়িয়ে গেল। মাতঙ্গ ঋষি তাঁর দিন ঘনিয়ে আসছে জানতে পেরে একদিন কুশাসনে বসে দেহত্যাগের জন্তে প্রস্তুত হলেন। শিষ্যকুল তাঁকে ঘিরে চোখের জলে তাঁর পুজো করতে লাগল। শবরীরও চোখের জল আর রোধ মানে না। সস্নেহ সম্বোধনে শবরীকে কাছে ডেকে ঋষি বললেন—'বৎস, তুমি শোক কর না। স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র হয়ে জন্মেছেন। তিনি শীঘ্রই এখানে এসে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। তারপর হবে তোমার স্বর্গলাভ। সে পর্যন্ত তুমি শুধু রাম রাম করে যাও, ঐ নামের মধ্যেই ডুবে থাক। সেইটাই হবে তোমার আমাকে সেবা

করবার পুরস্কার।' অন্যান্য শিষ্যকেও যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে মাতঙ্গ ঋষি দেবলোকে চলে গেলেন।

মাতঙ্গ ঋষির আশীর্বাদে শবরী রামভক্ত হয়ে উঠল। দিবারাত্রি রামনাম তার মুখে। বনের ফলমূল খায় আর রামের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে। পাতায় মর্মর শোনে আর ভাবে ঐ বুঝি এল রাম! ছুটে যায় বাইরে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। কখন আসবে কে জানে! ফলগুলি খেয়ে খেয়ে দেখে যেগুলি বেশ মিষ্টি সেগুলি দেয় রামের জন্যে রেখে। চোখের পাতায় তার ঘুম নামে না। গভীর রাত্রে আশ্রমের চারিদিকে চেয়ে দেখে যদি রামের পায়ের শব্দ কানে পৌঁছায়। রামের চিন্তায় সে এমনি আত্মহারা হয়ে যায় যে, তার বাহ্যজ্ঞান বলে কিছুই থাকে না।

জীবনের প্রান্তে একদিন দণ্ডকে রামের আগমনবার্তা তার কানে এল। তার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অকস্মাৎ! তাড়াতাড়ি সেরা সেরা ফলগুলি রামের জন্যে সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে ছুটে চলল নদীতে জল আনতে। যেতেই পথে পড়ল এক মুনি। তিনি স্নান সেরে তাঁর আশ্রমে ফিরছিলেন। পাছে মুনি অপবিত্র হয়ে যান এই ভয়ে শবরী এক পাশে ছুটে যেতেই তার ছায়া মুনিবরের পদস্পর্শ করল। মুনিবর অমনি ক্ষিপ্ত হয়ে শবরীর উপর অজস্র গালিবর্ষণ করে আবার চললেন নদীতে স্নান করে শুদ্ধাচারী হতে। ও হরি! মুহূর্তের মধ্যে এ কি হল! নদীর জল সাদা ফেনায় আচ্ছন্ন—রোগের বীজাণু বোধ হয়। হাত দিয়ে ফেনা দূরে সরিয়ে মুনিবর কোন রকমে স্নান সেরে আবার শুদ্ধাচারী হয়ে ঘরে ফিরলেন।

... ...

ইতিমধ্যে শবরী নদী থেকে পরিষ্কার জল তুলে এনেছে রামের জন্যে। বিস্মিত হয়ে দেখে তার কুটিরে রাম ও লক্ষ্মণ হাজির। শ্রীরাম জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় আমার শবরী? সত্যি, সত্যিই রাম এলেন শেষে তার পর্ণকুটিরে! আনন্দে আত্মহারা হয়ে শবরী লুটিয়ে পড়ল রামের পায়ের তলায়। সেই ধনুর্বাণধারী, পদ্মপলাশলোচনকে দেখে শবরী বিহ্বল—করতালি দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে সারা উঠান কাঁপিয়ে তুলল। সে নাচ আর থামে না, কাপড়-চোপড় সব খসে পড়ছে, সেদিকে তার হুঁস নেই আদৌ।

পতিতং চোত্তরীয়ং তু পরিধানীয়মব্যহো।
তথাপি ন নিবৃত্তা সা নিমগ্নানন্দসাগরে॥

কি কর, কি কর শবরী ? তোমার রাম যে তোমার সামনেই অতিথি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষণ শবরীর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন।

শবরী সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি রাম-লক্ষণের কাছে এসে অতি ভক্তিভরে উভয়ের পা ধুয়ে দিয়ে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করল। সবচেয়ে সেরা ফলগুলি আনল, আনল নির্মল জল। লোভাতুরের মত রাম-লক্ষণ উভয়েই শবরীর হাতের আহার্য গ্রহণ করলেন। শবরীর আজ বাসনার শেষ—জীবন তার সার্থক।

শ্রীরাম বললেন—শবরী, তোমার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। কি বর চাও বল তুমি, আমি তা-ই দেব।

উত্তরে শবরী বলল—প্রভুকে চাক্ষুষ দেখার পর আর কি তার চাইবার থাকতে পারে ! সে শুধু এই চায় যে, প্রভুর প্রতি ভক্তি যেন তার আরও বৃদ্ধি পায়।

রাম বললেন—তথাস্তু !

আনন্দে শবরীর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিষ্পলক তার চোখের দৃষ্টি রামের মুখের পানে এবং কিছুক্ষণ বাদেই সে দৃষ্টিও হারিয়ে গেল চোখের পাতার নিচে। শবরীর আত্মা তখন আনন্দলোকে।

শবরীর কাহিনী শেষ করে ঋষিদা বললেন—দেখলি নিষ্ঠা কাকে বলে, কাকে বলে ভক্তি ! নিজেকে হারিয়ে পরমাত্মার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার জলন্ত দৃষ্টান্ত এই শবরী। একেই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Integral Yoga পূর্ণযোগ বা বা আত্মসমর্পণ যোগ। এই জিনিসই তো খুঁজে খুঁজে বেড়াই সর্বত্র, এ পোড়া কপালে তা মেলে কই ?

প্রবোধের দিকে তাকিয়ে ঋষিদা বললেন—বুঝলি 'লভ' কাকে বলে। তোদের লভ তো দুইটি নর-নারীর লালসাকে কেন্দ্র করে তারই আশেপাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। ইনিয়ে-বিনিয়ে কতকগুলি কথার সৃষ্টি বা বুদবুদের মত ফেনার সৃষ্টি করে অচিরেই মিলিয়ে যায় ! কিন্তু সেই বাল্মীকির যুগ থেকে এযাবৎ কাল শবরী বেঁচে আছে—তার মৃত্যু নেই, সে অমর। আচ্ছা, তুই তো নাম-করা গল্প-লিখিয়ে, লেখ দেখি এমন গল্প। লিখবি আমাদের কাগজে ? কাগজখানা আমরাই বার করি মাসে মাসে, আমিই তার সম্পাদক। যাস না একদিন আমাদের ওখানে। যাবি ১নং মহেশ চৌধুরী লেনে আমাদের আশ্রমে ? অধ্যাত্ম-তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি বলে নাক সিঁটকে সব উড়িয়ে দিস নে। কথা দে যাবি একদিন সন্ধ্যার দিকে আরতির সময়। ঘি-চপচপ পরোটা আর তারই সঙ্গে জম্পেশযুক্ত মেঠাই, পেটভরা প্রসাদ পাবি।

ঋষিদা নিক্রান্ত হলেন, আর যাবার সময় মনে করিয়ে দিলেন—ঘি-চপচপ, খাঁটি ঘি রে, ভেজাল নেই।

অতঃপর আমরা একদিন সত্যিই গিয়েছিলাম বিশুদ্ধানন্দ গিরির আশ্রমে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছিল তাই ঘি-চপচপে প্রসাদ কপালে সামান্যই জুটেছিল। বলা বাহুল্য, ঋষিদা তাঁর অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কাগজও প্রবোধকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবোধ তাতে গল্প লেখে নি কোনদিনও।

এর কিছুকাল পরে ঋষিদা হরিদ্বার-মত্রদেশ ইত্যাদি ঘুরে আবার কলকাতায় ফিরেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র রণজিৎ সস্ত্রীক কলকাতাতেই থাকে। পুত্র-পুত্রবধূর ওখানে হয়ত রইলেন একদিন, দুদিন বা কাটালেন তাঁর পরম সুহৃদ উপেন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে, আরও কদিন বা অন্যত্র। সেই ঘুরে ঘুরে সংসারী মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়া।

দেখি একদিন গ্রে স্ট্রীট আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ের ওখানে একটু এগিয়ে একটা খাবারের দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন ঋষিদা।

কি খবর ঋষিদা?

শচীনের ওখানে যাচ্ছি ভাই একবার।

পাতলা ঠোঁটের দুকূলে দেখি ঋষিদার সেই সরল অম্লান হাসি। মৃদু সুরের সেই মিষ্টি কথা!

আমিও শচীনদার ওখানে যাচ্ছিলাম। বললেন—চল যাই।

হাতিবাগান বাজারে ঢুকতেই রাস্তার গায়েই দোতলার ঘরখানিতে থাকতেন শচীন সেনগুপ্ত (নাট্যকার)। ঘরে ঢুকেই ঋষিদা তাঁর গেরুয়ার আলখেল্লায় ঢাকা খাবারের ঠোঙাটি বার করে বললেন—ও শচীন, তোমার জন্য এই খাবারটুকু এনেছি।

ঠোঙায় ছিল গরম গরম নিমকি, সিঙারা কয়েকখানা, আর গোটাকতক সন্দেশ।

একখানা খাটের উপর ময়লা বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়েছিলেন শচীনদা। এককোণে একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলের গায়ে ভাঙা চেয়ার একখানি। টেবিলের উপর উচ্ছিষ্ট বাসি খাবার কদিন ধরে শুকোচ্ছিল কে জানে? শচীনদার তখন কোনদিন খাওয়া হয়, কোনদিন বা হয় না। টেবিলের দিকে চেয়ে মনে হল দু-তিন দিন হয়ত উপোসেই কেটেছে তাঁর।

শচীনদার ওখানে প্রায়ই যাতায়াত ছিল আমার। এমন অসাধারণ কষ্ট-

সহিষ্ণু, স্বাধীনচেতা, নিরবলম্ব পুরুষ বড় বেশি চোখে পড়ে না। উইপোকা-ধরা ঘরের চারদিকে এবং মলিন বিছানায় ইতস্তত ছড়ান রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে এই মলিন বেশধারী সাহিত্যসাধক যেন শবের বুকে শিবের মত তাঁর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। যাকে বলে জাত সাহিত্যিক—তিনি ছিলেন তাই।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন শচীনদা ঋষিদার মুখের দিকে। তারপর তড়াক করে খাট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা হাতে নিয়ে বললেন—ঋষিদা! তুমি না সন্ন্যাসী হয়েছ। দয়া দেখাতে এসেছ আমাকে? যাও তুমি এক্ষুনি আমার এখান থেকে। নইলে লাঠিপেটা করব। এক্ষুনি যাও, যাও বলছি।

শচীন সেনগুপ্ত কারও দয়া ভিক্ষা করেন নি কোনদিন। কোনদিন মাথা নত করেন নি কারও কাছে। নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সত্যানুরাগী শচীন সেনগুপ্তের এ রুদ্রমূর্তি ঋষিদা দেখেন নি কোনদিন।

শচীনদার এটা কৃত্রিম ক্রোধ নয়। তাঁর মেজাজ যে কখন দপ করে জ্বলে উঠবে তা কেউ বলতে পারত না।

—খাও না শচীন, তোমার জন্য যে এনেছি।—মৃদু অথচ আর্তকণ্ঠে ঋষিদার অনুরোধ। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে।

শচীনদারও তখন ছলছল চোখ। হাতের লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে তিনি ঋষিদাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য।

এ দৃশ্যও চোখে দেখে এসেছি।

৭

নিরীহ গোবেচারা লোক অবিনাশ ভট্টাচার্য। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। অথচ এই লোকটার বুকে একদিন আগুন জ্বলত। ভাবতেও পারতাম না ১৯০৫-এর রাষ্ট্রবিপ্লবে কি করে এই লোকটি বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্যে, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল ও উল্লাসকর দত্তের দলে ভিড়ে অগ্নিকাণ্ড করেছিলেন।

সাধারণত তিনি আমাদের এদিকে পা বাড়াতেন না। একদিন দেখি তিনি হাতে কিসের একটা প্যাকেট নিয়ে আমাদের বৈঠকে ঢুকলেন। গায়ে একটা সার্ট আর তার উপর একখানা সুতির চাদর। সবে শীত পড়েছে তখন।

একটু বিস্মিত হলাম। বললাম—কি খবর অবিদা! এখানে কি পথ ভুলে?

না ভাই, পথ ভুলি নি। এসেছিলুম একটা গরম কোট কিনতে। হাতের প্যাকেটটি দেখিয়ে বললেন—এইটি নিয়ে এলুম। হাঁপানি আছে কিনা, শীত পড়লেই ও-রোগটা চাঙ্গা হয়ে উঠে আমাকে একটু বেগ দেয়। একজন বলেছিল কাঁচা তেঁতুলের ঝোল খেলে রোগটা একটু ঠাণ্ডা থাকে। কথাটা সত্যি। নিত্য ঐ বস্তু পান করি, তাতে ভাল আছি। জানতুম পাশেই তোমাদের দোকান, তাই ভাবলুম একবার ঢুঁ মেরে যাই।

যদিচ আমার কাছে অবিদা অত্যন্ত সুপরিচিত তথাপি আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা অবিনাশ ভট্টাচার্যের নাম শুনেছে অথচ তাঁকে চোখে দেখে নি। সবারই চোখে সাগ্রহ ঔৎসুক্য। আজ যখন তাঁকে কাছে পাওয়া গেছে, তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু শোনা যাক। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই), এমন কি এঁদের বিপ্লবের গুরু অরবিন্দ ঘোষও তাঁদের বন্দী জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু অবিনাশ ভট্টাচার্য কিছুই লেখেন নি। সকলেই ধরে বসল আজ তিনি তাঁর জীবনের কথা কিছু বলুন।

অবিদা শুরু করলেন—

দেখ ছোটবেলায় আমরা রঙ্গলালের গানটা 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' খুব গাইতুম। পরাধীনতার জ্বালা যে খুব অনুভব করতুম তা নয়, তবে অভ্যাস মত গাইতুম। বুয়োরে ইংরেজে যুদ্ধ লেগে গেছে—রজনী সেনের এই গান শুনলে কেমন যেন একটা উন্মাদনা আসত আর ইংরেজ মার খাচ্ছে জেনে খুশি হতুম। থাক সে কথা। আসলে দেশের মাটির প্রতি টান হল যখন অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে বাংলার নাড়ির খবর রাখছিলেন। বাংলা দেশে জন্মে যিনি বাংলা জানতেন না, শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত যাঁর শিক্ষার বনিয়াদ গড়েছিল বিদেশে আর বিদেশী বহু ভাষায় যিনি মহাপণ্ডিত, যাঁর পাকা সাহেব হওয়া উচিত ছিল, সেই লোক কি করে পাকা স্বদেশী হতে পারে তা ভাবতে পারতুম না। তখনকার সমাজে এই অঘটন ঘটে গেল বলেই বোধ হয় স্বদেশপ্রেমে মেতে উঠলুম।

তারপর বোমা-বারুদ নিয়ে ইংরেজ প্রভুদের দেশ থেকে তাড়ানর স্বপ্ন, মানিকতলার বাগানে সব ধরা পড়া, আলিপুর আদালতে বিরাট বোমার মমলার বিচার ইত্যাদি সব ইতিহাসই তোমাদের জানা। সুতরাং তার পুনরুক্তি করে লাভ নেই। আমার জীবনে যা যা স্মরণীয় আছে তাই কিছু কিছু বলব।

প্রথমে বলি আমাদের পরিবারের কথা একটু। বাবা উমাচরণ ছিলেন পুরো সাহেবি মেজাজের লোক। জাহাজ থেকে মাটি খোলাই করে তার থেকে নানা খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে কারবার করতেন তিনি সালকে অঞ্চলে। এই কারবারে তিনি এক সাহেব ম্যানেজার রেখেছিলেন। এই সাহেবের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে ইংরাজি বুলির খই ফুটাতেন। কেন না 'বড়া সাব' তিনি তখন।

কিন্তু এমনি সাহেবিয়ানা তিনি করে ফেললেন যে, যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড এদেশে এলে যখন জগদানন্দ মুখুজ্যে তাঁকে নিজ পরিবারের মেয়েদের দ্বারা পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে পুজো করেছিলেন তখন তিনিও ছিলেন সেই দলে। বাবা আমার মাকেও বাধ্য করেছিলেন যুবরাজকে ফুল বিল্বপত্র দিয়ে পুজো করতে।

পরে একদিন এই কলঙ্কের কথা তুলে মাকে বলেছিলুম—মা, শেষপর্যন্ত তুমিও এই কাজ করেছিলে? মা বললেন কি করব বাবা, আমি কি অতশত বুঝি? উনি যে বললেন তাই। অর্থাৎ সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হয়েছিল।

এহেন সাহেবের বড় ভাই প্রসন্ন তর্কচূড়ামণি কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ইংরাজির ই-ও তিনি জানতেন না। সংস্কৃত টোলে-পড়া পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও তখনকার দিনে ছড়িয়েছিল অনেক দূর। প্রায় ছ ফুট লম্বা ছিল তার দেহ। দিব্যি গৌরকান্ত, সৌম্য, সুন্দর চেহারা। এই জ্যেঠা-মশায়ের প্রভাব পড়েছিল আমার উপর খুব বেশি। তখনকার কালে কলকাতার বহু অভিজাত পরিবারের শ্রদ্ধেয় ছিলেন তিনি।

জ্যেঠামশায়ের একটা মজার কাণ্ডের কথা বলি শোন। রমেশ মিত্তির তখন হাইকোর্টের জজ। কী একটা উপলক্ষে একবার তিনি তাঁদের প্রধান বিচারপতিকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনলেন প্রধান অতিথিরূপে। বলা বাহুল্য, তিনি একেবারে খাস ইংরেজ। বহু লোকের সমাগম হয়েছিল সেদিন রমেশ মিত্তিরের বাড়িতে। খানাপিনার পর গাল-গল্প হাসিঠাট্টায় মজলিস যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় এলেন প্রসন্নচন্দ্র। উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভিবাদন করলেন। রমেশ মিত্তিরের পাশের চেয়ারটিতে বসেছিলেন তাঁর ভায়া আমার বাবা, তিনিও গিয়ে দখল করলেন ভায়ার পাশের চেয়ারটি, কারণ ইংরাজির অর্থ তাঁর কাছে বুঝে নিতে হবে তো।

কী খেয়াল হল, কথাবার্তার মধ্যে এক সময় প্রধান বিচারপতি হঠাৎ রমেশ মিত্তিরকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কোন্ জাত বড়? রমেশ

মিত্তির মশায় সাহেবকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সমাজে কায়স্থই সব চেয়ে বড়। বাবা তখন জ্যেঠামশায়কে কানে কানে বললেন—দাদা, শুনেছ রমেশ মিত্তির সাহেবকে বললে যে, কায়স্থই সব চেয়ে বড় জাত আমাদের মধ্যে।

জ্যেঠামশাই বললেন—এঁ্যা? বললে এই কথা? বললে রমেশ? বলেই তাঁর ডান পাখানি তুলেই একেবারে রমেশ মিত্তিরের মাথায় রেখে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন—শুভমস্তু।

অতঃপর পাখানি সরিয়ে নিয়ে নিজের মাথাটি নত করে রমেশকে আহ্বান করলেন—এইবার দাও দেখি তোমার পদধূলি এই মাথায়?

এমন ভয়াবহ যুদ্ধে রমেশকে আহূত হতে হবে তা তিনি কখনও কল্পনাও করেন নি। তাঁর পা দূরে থাক, মুখও উপরের দিকে উঠতে চায় নি। সভার মাঝে এমনভাবে পরাজিত হলেও রমেশ অপ্রসন্ন হন নি, লজ্জিত বিস্ময়ে তিনি শুধু মাটির দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। এত সহজে যে কৌলীন্য যাচাই হতে পারে তা প্রধান বিচারপতিরও ধারণার অতীত ছিল।

১৯০০ সালে বাবা মারা গেলেন। তারপরের বছরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় এসে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হলুম। কলেজে ভর্তি হবার কিছুদিন বাদে গ্রামে এসে দেখলুম গ্রামের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জান তো আমাদের গ্রামের নাম আড়বেলিয়া। ঐখানেই জন্মেছিলেন নরেন ভট্টাচার্য যিনি পরে মানবেন্দ্র রায় নামে বিখ্যাত হয়েছেন। ব্যায়ামকেন্দ্র, সভাসমিতি ইত্যাদি সর্বত্র; সে কী উৎসাহ, উন্মাদনা। দেশকে স্বাধীন করতে হবে—এই মন্ত্রের সাধনা চলছে তখন। এই নবজাগ্রত চেতনার মূর্তরূপ ধরেছিল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এ। ঐ মঠ থেকে ডাক আসত—'কোথায় আছ সন্তান দল? মায়ের শৃঙ্খল মোচনে কে হবে সৈনিক?'

যতীন মুখুজ্যে অরবিন্দ ঘোষের কল্যাণে বরোদা রাজ্যের সৈন্যবিভাগে ঢুকে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করে বাংলা দেশে এলেন স্বদেশী আন্দোলন চালাতে। বস্তুত অরবিন্দই পাঠিয়েছিলেন তাঁকে এখানে। তাঁর সঙ্গে বারীন, দেবব্রত বোস ও আমি লেগে গেলাম কাজে।

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে আঘাত করছে শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে, ঠিক সেই সময় আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লুম।

আমার জেঠতুত ভাই অরবিন্দের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। বস্তুত

ভালবাসতাম তাকে। অরবিন্দ যক্ষ্মারোগে ভুগে মারা যায়। মনে আছে তাকে অক্লান্ত সেবা করেও বাঁচাতে পারি নি। ফলে আমিও পড়লুম ঐ রোগে। তখনকার কালে নগেন মুখুজ্যে ছিলেন যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি আমার বুক পরীক্ষা করে বললেন, দুই দিকের ফুসফুসই প্রায় নিঃশেষ হয়েছে। সুতরাং তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলে গেলেন—আর বড় জোর পনের দিন এ রোগী বাঁচতে পারে। বাড়ির আবহাওয়া তখন কেমন বুঝতেই পার। সবাই যেন মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন। পিসিমা আমাকে বড্ড ভালবাসতেন। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন—একজন সাধু এসে তাঁকে জানাচ্ছেন, অবির জন্যে ভাবনা নেই, সে মরবে না। পিসিমা এই স্বপ্নের কথা পরদিন সকালে সকলকে জানালেন। একটা গভীর দুশ্চিন্তার দুঃসহ বেদনায় কে যেন একটু আশার প্রলেপ দিলে। সন্দিগ্ধ মন তবু প্রশ্ন করে—সারবে কি এ রোগ?

বারীন কাজে বেরিয়েছিল বাইরে। কলকাতায় ফিরেছে কদিন। ঠিক এই সময় তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক চিঠি এল। তাতে লিখেছে সে—

ভাই অবি,

আমি বরোদায় সেজদাকে (অরবিন্দকে) জানিয়েছিলাম তোমার অসুখের কথা। তিনি লিখছেন—অবিনাশ এতদিন ভুগছে, আমার কাছে পাঠাও নি কেন তাকে? তারপর কটক থেকে গণেশ আমায় লিখেছে যে, সেখানে নাকি এক অসাধারণ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁর অদ্ভুত চিকিৎসায় যক্ষ্মারোগীও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। তুমি সেখানে গেলেই ভাল হয়ে আসবে, একথা সে জোর করে বলেছে। গণেশকে আমি লিখে দিলাম তোমার জন্যে বাড়ি ঠিক করতে। তুমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হও অবিলম্বে।

ডাক্তাররা বললেন, যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট আছে তাও এবার শেষ হয়ে যাবে বিদেশে গেলে। যে রোগী নড়াচড়া করতে পারে না, তার পক্ষে এটা কি সম্ভব?

বারীন কিছুতেই ছাড়বে না। সে এবং দেবব্রত একরকম জোর করেই আমাকে পাঠালে কটকে।

শহরের উপকণ্ঠে প্রকাণ্ড এক প্রাচীন পাথরের বাড়ি। বাড়ির আশেপাশের জমির বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। স্থানে স্থানে গাছপালার ছায়াও অত্যন্ত ঘন। সীমানার চারদিককার প্রাচীর উঠেছে দোতলার কাছাকাছি। আমার সঙ্গে গেলেন আমার মা আর ছোট ভাই উপেন। এতবড় একটা বিরাট বাড়িতে আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী। গা ছমছম করত।

যথাসময়ে সন্ন্যাসী এলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলেন চারটি শাদা গুঁড়োর পুরিয়া আর সাতটি বড়ি। বললেন—প্রথমে চারদিন এই চারটি পুরিয়া খাবে; তারপর প্রতিদিন একটি করে এই সাতটি বড়ি খেয়ে ফেলবে। আর দেখ, ওষুধ খাওয়ার দিন থেকেই কিন্তু এক সের করে প্রতিদিন গাওয়া ঘি খাওয়া চাই। ভাতের সঙ্গে খাও, লুচি করে খাও—যেভাবেই খাও, যোদ্দা হওয়া চাই।

আরে ভাই সন্ন্যাসী তো ব্যবস্থা দিয়ে সরে পড়লেন। কিন্তু এক সের কেন, একপোয়া ঘি খাওয়ার সাহসও যে আমার নেই তা তিনি বুঝবেন কি করে? এই শীর্ণ, শুষ্ক দেহে এক সের ঘি যদি গলাধঃকরণ করি তবে একদিনেই অক্কা পেতে হবে—এই হল আশঙ্কা। ওষুধ খাওয়া শুরু করলুম এবং সেই সঙ্গে মেরেকেটে ছটাকখানেক ঘি পেটে পড়তে লাগল। কিন্তু শরীরের কোনই পরিবর্তন হল না বরং আরও শীর্ণ হয়ে গেলুম। বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরবার সামর্থ্যও চলে গেছে। একটা হতাশায় সকলের মন আচ্ছন্ন। শেষের দিন বুঝিবা ঘনিয়ে এল।

এই সময় একটি লোক এসে বাইরে থেকে আমার খবরাখবর নিয়ে যেতেন। লোকটি নাম বলতেন না। জিজ্ঞেস করতেন আমার কোন টাকার দরকার আছে কি না। নাম বলে না অথচ টাকা দিতে চায়, এই মহানুভব লোকটি কে? পুলিশের গুপ্তচর নয়তো? এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্থানেও ধাওয়া করেছে!—সন্দেহ জাগে।

উপেনকে একদিন বললুম লোকটাকে ঘরের ভিতর একবার ডেকে এনো তো। ভাল বোধ হচ্ছে না আমার।

ঘরের ভিতর লোকটি এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—কে আপনি? আপনার নাম?

হাসিমুখে জবাব দিলেন—আমার নাম যোগেশ ঘোষ। দেবব্রত আপনার খোঁজ-খবর নিতে বলেছে কিনা তাই। আর যদি কিছু টাকার—

দেবব্রতের নাম শুনলাম। ব্যস আর কিছু জানাবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। পুরা একমাস পরে সন্ন্যাসী এসে ঠিক হাজির একটা চাঙড়া হাতে করে। ঘরে ঢুকবার আগেই তিনি বললেন—এইবার রোগী যা ইচ্ছে তাই খেতে পারে। আমার সামনে এসে কিন্তু তাঁর

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

বিরক্তির সুরে জবাব দিলুম—কেমন আর থাকব, দেখতেই পাচ্ছেন। ওষুধের তো কোন ফলই হচ্ছে না।

—ঘি খাচ্ছ তুমি?

—খাচ্ছি বৈ কি?

—কতটুকু? আমি যে পরিমাণ বলেছিলাম তাই?

—ছটাক খানেক খাই। অত খাব কি করে?

—ছটাক খানেক! তুমি এখনও মর নি?—আশ্চর্য!

মহাক্রুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হল মহা অপরাধ করেছি। এই মুহূর্তে তাঁকে ফিরাতে পারলেও বোধ হয় জীবনের আশা আছে। মাকে সঙ্কেত করলুম। তিনি ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসীর পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন—একবারটি ফিরুন বাবা! রোগীর মুখের কথাটা একবার শুনে যান।

সন্ন্যাসী সদয় হলেন। তিনি ফিরতেই বললুম—আমার উপর মিছামিছি রাগ করবেন না, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারেন নি। অত ঘি যে আমি খাব তার পয়সা কোথায়? আপনার আদেশ কি আমি ইচ্ছে করে অমান্য করেছি? কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললুম নিজের অপরাধ ঢাকা দিতে।

সন্ন্যাসী বললেন—সে কথা বল নি কেন আগে? কিন্তু সে হবে না। ঘি তোমাকে খেতেই হবে রোজ অন্তত এক সের করে—তা যে করেই হক। তোমাকে যে আমি দিয়েছি বিষ।—এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

বিকেল বেলার দিকে একটা লোক এক টিন ঘি মাথায় করে নিয়ে এসে বললে—ঘি আছে বাবু।

ঘি? গাওয়া? ভাল তো? দ্রুত প্রশ্ন করে গেলুম।

—হাঁ বাবু, খাঁটি গাওয়া ঘি।

—তবে দাও পাঁচ সের।

—পাঁচ সের কেন, সবটাই রাখতে হবে।

—অত পয়সা আমার নেই।

—পয়সা আপনাকে দিতে হবে না কিছুই। এতে তিরিশ সের ঘি আছে। সবটাই আপনাকে রাখতে হবে সাধু বাবার হুকুম।

সাধু বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে গেল।

তারপর একমাস ধরে এই ঘি খেয়ে গেছি। ধীরে ধীরে এই জরাজীর্ণ দেহে মাংস দেখা দিল। সপ্তাহ দুই যেতেই কোথা থেকে এল সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। এ ক্ষুধায় বোধ করি লোহাও হজম হয়ে যায়। এক মাসে যা চেহারা হল তা কল্পনাও করা যায় না। বুঝতেই পার এর পরে টাকার প্রয়োজন।

দরকার হলেই এখন থেকে যোগেশ ঘোষের কাছে টাকা চাইতুম। চাইবা মাত্র তিনি কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করে এনে দিতেন। একদিন হিসেব করে দেখলুম আমি ইতিমধ্যে সাড়ে সাতশ টাকা নিয়ে ফেলেছি। ভয় হয়ে গেল অত টাকা শোধ করব কি করে। যোগেশ ঘোষ আমার সঙ্কোচের কথাটা জানতে পেরে একদিন প্রকাশ করলেন ঐ সম্পূর্ণ টাকাটাই দিয়েছেন জানকী বসু (সুভাষ বসুর পিতা)। তিনি টাকাটা দিয়েছিলেন ফিরে পাবার জন্য নয়। যোগেশ ঘোষও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনিও জানকী বসুর সময়ে কটকেই ওকালতি করতেন। এমন অমায়িক সৎ প্রকৃতির লোক বিরল। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে থাকতেন তাঁর ছোট ভাইয়ের বাসায়। ছোট ভাই ছিলেন কটকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। যোগেশবাবু অতঃপর সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন বিপ্লবের কাজে। বিপ্লবের নানা গুপ্ত সমিতিতে তিনি টাকা সংগ্রহ করে দিতেন। জানকী বসু ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

যা হক, পাঁচ-ছ মাস পরে যা স্বাস্থ্য হল তা অভূতপূর্ব। এমনটি যে হবে তা কল্পনাও করতে পারি নি।

বারীন বরোদা থেকে এসে কানাই ধর লেনে একটা বাড়ি ভাড়া করে সেখান থেকে কেবলই তাগিদ দিতে থাকে কলকাতায় ফিরতে, কেননা সে এখন 'যুগান্তর' পত্রিকা বার করবার সব আয়োজন শেষ করে ফেলেছে! আমার কিন্তু আরও কিছুকাল থাকবার ইচ্ছে ছিল। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তখন আমার এমনই লোভ হয়েছিল।

বারীনের জ্বালায় যখন আর থাকা সম্ভব নয়, তখন গেলুম সাধু বাবার কাছে বিদায় নিতে। নীরোগ হলেও আমার গলার বাঁ দিকে একটা মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে উঠেছিল আবের আকারে। সাধু বাবা ঐ মাংসপিণ্ডের দিকে চেয়ে বললেন —ঐটাই তোমাকে একটু বেগ দেবে। আরও কিছুকাল থাকলে ওটা মিলিয়ে যেত। যাক, এস আমার সঙ্গে একবার। এই বলে তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একটা মাঠের মধ্যে একরকম ঘাস দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এই ঘাসের

শিকড়ের সঙ্গে কয়েকটা গোলমরিচ বেঁটে তার প্রলেপ কদিন ঐখানটায় দিলে ওটা একেবারে মিলিয়ে যাবে।

কলকাতায় ফিরে সেই নগেন মুখুজ্যের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোথাও কিছু গলদ না পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এমন ধন্বন্তরিও থাকতে পারে।

অরবিন্দের কথা একটু বলি এইবার। ইংরেজি 'বন্দে মাতরম্' বেরুচ্ছে, এদিকে 'যুগান্তর'। এই সময় অরবিন্দ থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। রাজার বাড়িতে রাজার হালে থেকেও তিনি অসুবিধা বোধ করছিলেন। কারণ, অত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার ধাত তাঁর নয়। তাই একদিন তিনি আমায় বললেন, একটা আলাদা বাসা ভাড়া করতে। স্কটস্ লেনে একটা বাসা ভাড়া করে সেইখানে আমাদের সংসার পাতা হল। আমাদের সংসারে আমরা চারজন—অরবিন্দ, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী, বোন সরোজিনী আর আমি। এই সংসারে কর্তা বলতেও আমি, আর গিন্নী বলতেও আমি। কারণ, আসল কর্তা ও গিন্নী দুজনেই নির্লিপ্ত। বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে অরবিন্দ বসে আছেন সেই আগুনের মধ্যে নিবাতনিষ্কম্প রূপে। আগুন জ্বলছে, কিন্তু সে আগুনের তাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। খর্বাকৃতি, প্রশান্ত এই মানুষটির চোখে ছিল একটা অতলগর্ভ ভাব। সে ভাব যারা দেখেছে, তাদের মনে হত তাঁর এ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আছে যেন একটা অনির্বাণ আসক্তি; আর তার পিছনে আছে অন্তর্গূঢ় রহস্যলোক যেখানে তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ। বাইরের কর্মে তাঁর কোথাও বিচ্যুতি বা বিভ্রম নেই। যেন চলছে সবই কলের মত অথচ প্রায়ই দেখা যায় তিনি ধ্যানমগ্ন।

ভালরে ভাল, অরবিন্দের আবার এ কী হল! দেখলুম সকলের মধ্যে থেকেও তিনি সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নির্বিকার হয়ে যান। পোষাক-পরিচ্ছদের কোন বালাই নেই; যখন যা পান তাই খান, বাদ-প্রতিবাদ নেই।

একদিন দেখলুম আমাদের বাসায় এসেছেন একজন। নাম শুনলুম লেলে মহারাজ। তাঁকে এর আগে কোনদিন চোখে দেখি নি। শুনেছিলুম ইনিই অরবিন্দকে যোগের পথ দেখিয়েছেন। অরবিন্দের ধ্যান-ধারণা আরও বেড়ে গেল। খাওয়া দাঁড়াল এক মুঠো ভাত আর আলুসিদ্ধ।

বারীন অরবিন্দকে ডাকত সেজদা বলে। আমিও তাই তাঁকে সেজদা বলেই ডাকতুম। একদিন ধমক দিয়েই বললুম—কী এসব হচ্ছে, সেজদা? সেজদা নির্বাক। শুধু একটা অপার্থিব হাসি ভেসে রইল সেজদার দুটি ঠোঁটে।

এই লেলে মহারাজ আমাদের মানিকতলার বাগানেও একদিন গেলেন এবং আমাদের নতুন পথ দেখাবেন বললেন।

ছোকরার দলের তখন রক্ত গরম। আগুন নিয়ে খেলায় তারা মত্ত। বারীন, উপেন, উল্লাসকর প্রভৃতি কয়েকজনকে বসিয়ে লেলে মহারাজ তাদের ধ্যান করতে বললেন এবং যোগীবর নিজেও বসলেন ধ্যানে।

অনভ্যস্ত ছোকরার দল মাঝে মাঝে চোখ খুলে পরস্পরের ভঙ্গিটা একবার দেখে নেয় আবার চোখ বুজে। এমনি কিছুক্ষণ চলার পর লেলে বাবা চোখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে—কি দেখলে? সবাই সমস্বরে জবাব দিলে, কিছু না। দ্বিতীয়বারও অমনই অভিনয় চলল। লেলে বাবা এবারও ঐ একই প্রশ্ন করলেন। আমাদের মধ্যে উপেন ছিল ঠোঁটকাটা। সে লেলের প্রশ্নে জবাব দিলে—ঘণ্টা!

লেলে মহারাজ আর একবার ধ্যানে বসতে সবাইকে অনুরোধ করলেন। বার বার তিনবার।

এইবার এই তৃতীয়বার কী একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সবাই যেন ফিরে এল কোন্ এক অজানা রহস্যলোক থেকে, সেখানকার কথা শুধু হৃদয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু মুখে প্রকাশ করা যায় না। মোহাচ্ছন্নের মত সকলে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ যোগীবরের মুখের দিকে।

লেলে মহারাজ বললেন—ভারতের স্বাধীনতার জন্য তোমরা আকুল হয়েছ। ভারত স্বাধীন হবেই, কিন্তু তোমরা যে পথ নিয়েছ সে পথে নয়।—বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

বলা বাহুল্য, রজোগুণাশ্রিত সে মোহ দূর হতে বেশি সময় লাগে নি। সকলেই ভেবেছিল লেলে মহারাজের ওটা একটা নিছক সম্মোহনের ব্যাপার।

আচ্ছা, এবার আমাদের আন্দামানের একটা ঘটনার কথা বলি তোমাদের। একবার চীফ কমিশনার এলেন জেল পরিদর্শনে। আন্দামানে তখন বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকতেন বিখ্যাত মারাঠি বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকারও। আমি, সাভারকার এবং আরও কয়েকজন ছিলুম এক জায়গায়। সাহেব একখানা ইংরেজি গীতাঞ্জলি হাতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মহা উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাতি গাইতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতার সারমর্ম হল রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন তার কারণ তিনি ইংরেজি সভ্যতার মূল তত্ত্বটি

মনেপ্রাণে গ্রহণ করে তা নিজের জীবনে ফলিয়ে তুলেছেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষা সফল হয়েছে। বিপ্লবীরা বিপথে না গিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গ্রহণ করত তা হলে তাদের জীবন এমনিভাবে ব্যর্থ হত না। অর্থাৎ সাহেব সদুপদেশ দিচ্ছিলেন বিপ্লবীরা যেন শান্ত-শিষ্ট-সুবোধ বালক হয়ে রবীন্দ্রনাথের মত মান্য, বরেণ্য হবার চেষ্টা করে।

সাভারকার এই সাহেব পুঙ্গবের বক্তৃতা শুনে আর থাকতে পারলেন না। নির্ভীকভাবে সাহেবকে শুনিয়ে দিলেন—দেখ সাহেব, তুমি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে মুগ্ধ হয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ করতে এসেছ, তিনি কত বড়—ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার কী মনোমুগ্ধকর ফল। কিন্তু গীতাঞ্জলি পড়ে তোমার মত আমরা মুগ্ধ হই না। কারণ, ঐ রকম তত্ত্বকথা আমাদের দেশে অলিতে-গলিতে অমন কত ভেসে বেড়ায়। এ দেশের নিরক্ষর লোকের মুখেও ফোটে পদাবলী—যা তারা পেয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের বহু যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফলস্বরূপ। গীতাঞ্জলির জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে বড় বলি না। গীতাঞ্জলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টি আছে যেখানে তাঁর অভ্রভেদী প্রতিভা দেখে আমরা মুগ্ধ হই, যার জন্য এই মহামনীষী আমাদের বরণ্য, নমস্য।

সাহেব, তোমাদের শ্রদ্ধা কেমন জান? যেমন গোলগাল, সুন্দর দিশি কুকুর দেখলে তোমরা তার পিঠ চাপড়ে বল—বাঃ কুকুরটি তো বেশ!

রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে তোমরা ঐ রকম তাঁর পিঠ চাপড়েছ।

সাহেব আর হালে পানি না পেয়ে মুখটি লাল করে অতঃপর চম্পট দিলেন।

এইটুকু বলার পর, আজ তবে আসি ভাই,—বলে অবিদা বিদায় নিলেন।

৮

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পত্রপথে। সে অনেক দিনের কথা। তাঁর সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে দুচারটে কবিতা লিখে ফেলেছিলাম। কাঁচা বয়েসে নিজের নাম প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখলে আনন্দ-বিহ্বল হয় না এমন লেখক কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। আমারও এ দুর্বলতা যে কতখানি খুশির হিল্লোলে হিল্লোলিত তা লেখকমাত্রই বোধ করি অস্বীকার করবেন না।

আর একটা মোহ ছিল গর্বের। বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন বাঁড়ুজ্যের 'নির্বাসিতের

আত্মকথা' ধারাবাহিকভাবে বার হচ্ছিল ঐ কাগজেই। অসাধারণ লিখনভঙ্গি। মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডিকে হাস্যরসের ভিয়েনে চড়িয়ে তাকে মধুর করে তোলার এমন কৃতিত্ব বোধ হয় এর আগে আর দেখা যায় নি। বাংলা সাহিত্যে যেন একটা নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই লেখা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই লেখকের রচনা-শৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ভাবতাম বিস্ময়কর রচনা যে কাগজে ছাপা হয় তারই এককোণে এই অধমেরও একটুখানি স্থান আছে। এটাই ছিল গর্ব। আরও একটা মোহাঞ্জন ছিল চোখে। এই সব মৃত্যুঞ্জয় তুচ্ছকারী বিপ্লবী দল যেন চুম্বকের মত কাছে টানতেন, তাঁদের মনে করতাম অতিমানব।

তাঁদের কাছ থেকে এক টুকরো চিঠির জবাব পেলে নিজেকে মনে করতাম ধন্য। চিঠিও পেলাম একদিন বারীন্দ্রকুমারের—

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার বাড়ি ত কলকাতার কাছেই। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে একদিন চলে এস না আমার এখানে, দেখা হবে। বৌবাজার স্ট্রীটে চেরি প্রেসে আমি থাকি।

বারীন্দ্রকুমার ভেবেছিলেন আমার বাড়ি হুগলি জেলার বাঁশবেড়ে অঞ্চলে। কিন্তু আর একটা বাঁশবেড়ে যে নদে জেলাতেও থাকতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না।

যা হক, হাজির হলাম একদিন চেরি প্রেসে। দোতলার অফিস ঘরের সামনে এক ফালি বারান্দার রেলিং ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুনলাম তিনি স্নানঘরে গেছেন তেতলায়। একটু পরেই নজরে পড়ল তিনি তেতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন দোতলায়। পরনে শুভ্র একখানি ফরাশডাঙ্গার ধুতি, গায়ে একটি শুভ্র গেঞ্জি, কোঁচার অংশটুকু গলায় ঝুলান। চোখে পুরু কাচের চশমা। মাথার চুলে মাঝখানে সিঁথি। ছিপ্‌ছিপে চেহারা—সদ্যস্নাত, স্নিগ্ধ। ভক্তিভরে পদধূলি নিতেই বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। অপরিচিতের পরিচয় নেবার কৌতূহল তাঁর চোখে। মাথার চুলের একটা সুরভি আবেশ ভেসে বেড়াচ্ছিল আশেপাশে।

বললাম—আমি অমুক।

হ্যাঁ, এসেছ। এস এস।

খুশির হাসিতে মুখখানি ভরা। এ আহ্বান যেন একান্ত আপন জনের।

মাত্র আধ ঘণ্টা ছিলাম তাঁর অফিস ঘরে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে মিনিই

আসেন, তিনিই বারীনদা বলে সম্বোধন করে কাজের কিছিত্তি দিয়ে তাঁর নির্দেশ নিয়ে চলে যান।

তাঁর কাজের অসুবিধা হচ্ছে মনে করে আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম —এবার যাই বারীনদা।

—এস ভাই, এদিকে এলে ঘুরে যেও মাঝে মাঝে।

এই চাক্ষুষ দেখার দিন থেকেই আমিও তাঁর অগণিত ভাইদের দলে একজন হয়ে গেলাম। বোমারু দলের পাণ্ডা বারীন ঘোষের চেহারা মনে মনে একটা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। গোবর পালোয়ান না হক, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, পেশীবহুল একটি লোককে তো দেখবই। গলার আওয়াজ হবে গুরুগম্ভীর। ও হরি! এ যে কিছুই নয়। আমাদেরই মত নিতান্ত সাধারণ মানুষ। স্নেহভরা মন, আদর-আপ্যায়নে উদার-হৃদয়। অসাধারণত্ব কোথায়; তা ধরবার উপায় নেই। এটা বলছি ১৯২৩-২৪ সালের কথা। এর আগে তিনি কিছুকাল পণ্ডিচেরি আশ্রমে কাটিয়ে এসেছিলেন।

আর একদিন একখানা চিঠি এল। তাতে বারীনদা লিখছেন—আমি এখন ভবানীপুর রায় স্ট্রীটে থাকি। এলে দুপুরের দিকে এস।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল তখন। দুপুরের দিকেই গেলাম একদিন। আর এক রূপ দেখলাম সেদিন বারীন ঘোষের। মিহি গলায়ও ভারি বিষয়ের আলোচনার দিকে ঝোঁক। বুঝলাম পণ্ডিচেরি আশ্রমের বাতাস গায়ে লাগিয়ে এসেছেন।

হঠাৎ এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—ওঃ দুটো বাজে এখন। আর নয়, এবার আমার ধ্যান করবার সময়। বলেই ইজি চেয়ারখানা কোণ থেকে টেনে এনে তাতে বসে পড়লেন। আমিও বেগতিক দেখে উঠে পড়তেই তিনি আমাকে এস ভাই বলে আরামে চোখ বুজলেন।

এ আবার কি হল! বারীনদার এ বাতিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তা জানতে পারি নি। এমন হৃদয়-খোলা, প্রাণ-চঞ্চল লোকটি যেন কর্ম কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সরে যেতে চান অন্তরালে!

তারপর একদিন খবর এল পণ্ডিচেরি থেকে তিনি আশ্রমবাসী, সাধনায় রত। লিখলেন আমাকে—

আমি এখন সাধনা নিয়ে আছি। বাংলা দেশে আর ফিরব কিনা সন্দেহ। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মালিক আর আমি নই। এ বড় দুর্গম পথ—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।'

বারীনদার জীবন চলেছে নতুন খাতে। তারই উৎস খুঁজবার চেষ্টা করতে থাকি।

বাংলাদেশে বোমা ফাটাবার আগে তিনি ছিলেন তাঁর সেজদার (অরবিন্দ ঘোষ) কাছে বারোদায়। সেখানে এবং সেখান থেকে দূরে আরও কত দূরে গভীর অরণ্যে ও পর্বতগুহায় ঘুরে ঘুরে বেরাতেন সাধুর সন্ধানে। সে সন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রাজনীতিক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়। তাঁর ধারণা ছিল, সাধুরা হচ্ছেন যৌগিক শক্তির ধারক—যাঁরা বহন করেন এই মাণিক তারই খানিক যদি তিনি আদায় করতে পারেন তবে কেল্লা ফতে করে ছাড়বেন।

তাঁর প্রথম গুরু সাকারিয়া স্বামী। এই স্বামীজি সিপাহি-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি যাঁরা সুরাট কংগ্রেসে দক্ষ-যজ্ঞ করেছিলেন, স্বামীজি সেই দলে। উগ্র স্বদেশপ্রেমের প্রচণ্ড আবেগে রুদ্রমূর্তি ধারণের ফলে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়। বহুদিন আগে এক ক্ষেপা কুকুরের দংশনে তাঁর শরীরে যে বিষ প্রবেশ করেছিল তা তিনি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন এতদিন যোগবলে। তাঁর এই অসতর্ক মুহূর্তে সেই সুপ্ত বিষ জেগে উঠে তাঁর মৃত্যু ঘটাল।

মারাঠি যোগী লেলে বাবার সংস্পর্শেও বারীনদা এসেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। আর একটা বাতিকও হয়েছিল বারীনদার, পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। এ জন্যে তিনি ধরেছিলেন Automatic writing (স্বতঃ লিখন) এবং এতে তিনি বেশ হাতও পাকিয়েছিলেন। অনেক সময় অনেক বিস্ময়কর কথা তাঁর হাত দিয়ে বার হয়ে যেত। এমন অনেক ভবিষ্যবাণীও তাঁর কাছ থেকে জানা গিয়েছিল যা সত্য বলে উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছিল। এ-সব ব্যাপার ঘটেছিল বরোদায় তাঁর সেজদার কাছে অবস্থান কালে। সেজদাও তাঁর ভায়ার কাণ্ডকারখানা দেখে কৌতূহলবশত এ-বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটা ছিল যেন তাঁর স্রেফ কৌতুক-ক্রীড়া। এর মধ্যে কোন গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে কি না তাই উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন এবং কিছুদিন বাদেই এ খেলা তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করেন, কারণ তাঁর মতে এটা অতি নিম্নস্তরের জিনিস—এর মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক সত্যের সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন নি। বারীনদার এই স্বতঃলিখন সম্বন্ধে তাঁর সেজদা যা বলেছেন তার একটু উদ্ধৃতি বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন—

Barin had done some very extraordinary automatic writing at Baroda in a very brilliant and beautiful English style and remarkable for certain predictions which came true and statements of facts which also proved to be true although unknown to the persons concerned or anyone else present: there was notably a symbolic anticipation of Lord Curzon's subsequent unezpected departure from India and again, of the first suppression of the national movement and the greatness of Tilak's attitude amidst the storm; this prediction was given in Tilak's own presence when he visited Sri Aurobindo at Baroda and happened to enter first when the writing was in progress.

আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করছি বারীনদার মনোভাব বিশ্লেষণের জন্যে। আমার মনে হয় উর্ধ্বলোকের প্রতি তাঁর আকৃতির জন্ম এইখান থেকেই। তাঁর সারা জীবনে ঐ ধারাই বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা পথে।

১৯৩০ সাল বোধ হয়। বারীনদা হুম করে পণ্ডিচেরি থেকে উপস্থিত হলেন ঠিক আমারই আস্তানায় অর্থাৎ আর্য পাবলিশিং হাউসে। যদিও এটা আমার কর্মস্থল, তবু বাসস্থানও বটে। বারীনদা তা জানতেন। কাজেই ধর্মস্থল না হলেও তিনি এখানেই উঠলেন আপাতত আশ্রয় হিসাবে। কলকাতা শহরে হঠাৎ কোন বাসগৃহ পাওয়া সহজ নয়। তার জন্যে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। আর তা ছাড়া সে রকম কোন ব্যবস্থা করতে গেলে হাতে যে সম্বল থাকা প্রয়োজন তাও বোধ হয় তাঁর ছিল না।

খুবই অবাক হলাম। আগে থেকে কোন সংবাদ না দিয়ে অকস্মাৎ এভাবে হাজির হবার উদ্দেশ্য কি? কোন মহৎ কার্য সাধন, না আর কিছু? ভাবলাম পণ্ডিচেরি থেকে মাঝে মাঝে সাধকরা আসতেন কোন কাজ নিয়ে, কাজ ফুরোলে আবার ফিরে যেতেন। বারীনদাও বোধ হয় সেই রকম কিছু কাজ নিয়ে এসেছেন।

আজানু না হোক আকটিবিলম্বিত মাথার চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ, অবাক হচ্ছ? তোমার ঘাড়ে চেপে থাকব এখানে অন্তত মাসখানেক।

থাকুন না। সে তো আনন্দের কথা। আপনাদের মত লোকের সঙ্গ পাওয়া কয়জনের ভাগ্যে জোটে?

বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ভিড় জমে যায়। প্রশ্ন করেন তাঁরা বারীনদাকে—কি হেতু তাঁর আগমন বাংলাদেশে? কতদিনের জন্যে? বর্তমান রাজনীতির আবহাওয়া সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি? তাঁর নিজের কিছু করণীয় আছে কি না? পণ্ডিচেরির ঋষির কোন নির্দেশ আছে কি? ইত্যাদি।

বারীনদা সব কথারই জবাব দিয়ে যান। কিন্তু তাঁর মনের আসল কথাটি যেন উহ্য থেকে যায়।

কেউ দেখেন তাঁর চোখে যোগাভ্যাসের জ্যোতি, কেউ বা তাঁর অন্যমনস্কতায় খুঁজে বার করেন কোন রহস্যলোকের বার্তা। ক্যামেরায় ছবি ওঠে—কিড়িক্ কিড়িক্!

আমি দেখি বারীনদার পুরু কাচের চশমার আড়ালে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি!

দিনগুলি বেশ কাটে বারীনদার সঙ্গে। তাঁকে নিয়ে এক সঙ্গে বাস করবার সংকোচ কেটে যায় বারীনদার স্নেহবৎসল হৃদয়ের পরিচয়ে। কথায় কথায় পণ্ডিচেরি আশ্রমের কথা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করি। উৎসাহভরে বারীনদা আশ্রমের আবহাওয়ার চিত্র দেন। সে চিত্র চাক্ষুষ না দেখলেও মানস-চক্ষে কল্পনা করেও তাঁর সুখস্পর্শ পাই।

বারীনদা চিত্রশিল্পী। ছবি আঁকায় বেশ হাত ছিল তাঁর।

আমার পিছন দিককার গোলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁর আঁকা কয়েকখানা ফুলের ছবিও তিনি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। কোনখানার তলায় লেখা আছে Purity, কোনখানায় বা Chastity আবার কোনখানার নামকরণ হয়েছে 'Aspiration', বারীনদা বলেন—পণ্ডিচেরি ফুলের রাজ্য। মনোময় মানুষের স্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতির স্বভাবেরও মিল আছে। যোগীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এ-সব। আমার ঐ ছবিগুলির নামকরণ দেখছ, এগুলি আশ্রমের শ্রীমার দেওয়া।

সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রায় সকলেই বারীনদার সঙ্গে জমে গেল। নজরুলের তো কথাই নেই। সে ঘন ঘন আসে যায়। বারীনদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে নজরুলের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। বিদ্রোহী কবি বিপ্লবী বারীন ঘোষের হৃদয় জয় করেছিলেন চেরি প্রেসের আমল থেকে।

সকাল হলেই বারীনদা উস্‌খুস্ করেন চায়ের নেশায়। সরঞ্জাম আমার সবই ছিল। নিচে নেমে ছ পয়সা দামের একখানা ব্রাউন ব্রেড আর চার পয়সার মাখন কিনে উপরে উঠতেই দেখি স্টোভ জালিয়ে বারীনদা চা তৈরি করে ফেলেছেন। এ-বিষয়ে বারীনদা বেশ ওস্তাদ। আমাদের প্রাতরাশ ছিল ঐ। কোন দিন বা সখ করে বারীনদা খাওয়াতেন ডিমের ওমলেট।

তুপুর বেলায় একদিন বারীনদা বললেন—চা খাবে?—চা?

চা! এখন যে মাত্র বেলা একটা!—তাতে কি, any time is tea time. আরে তুপুরের আহারের পরই চা খেতে আরও মজা। খাও নি কখনও?

না। এ বদভ্যাস আমার ছিল না। অর্থাৎ তুপুরের সময় এর আগে আর কখনও চা খাই নি, যদিচ সুভাষ বোসের কল্যাণে কাগজের অফিসে গিয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত দশটার মধ্যে বার চারেক বিনি পয়সার চা গলাধঃকরণ করতাম। বারীনদার তাড়ায় নতুন বদভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভাবতাম আচ্ছা যোগীর পাল্লায় পড়লাম দেখছি—ইনি-মাছ-মাংস-ডিম সবই খান, আবার বার বার মাতালের মত চা-পানেও আপত্তি নেই।

বেশ কেটে যাচ্ছে আমাদের তুজনের সংসার। গুরুগম্ভীর আলোচনার সঙ্গে লঘু বিষয় নিয়েও বারীনদা বেশ রসিয়ে তুলতে জানেন।

একদিন হঠাৎ বললেন—আলোটালো কিছু দেখতে পাও?

কিসের আলো তা বুঝলাম না। বারীনদা হয়ত ধ্যানের বিষয় জানতে চান। আমি যে ও-রসে রসিক নই তা তিনি নিশ্চয় জানতেন, তবু এ কৌতূহল হল কেন? কিংবা ও-বিষয়ে কিছু আলোচনা করবার সূচনা এটা?

আরে ভাই ধ্যান করব কি? ধ্যানে বসলেই মানস-চক্ষে যা ভেসে ওঠে তা রমণীর দেহ…!—এটা যে যোগসাধনার ঘোরতর পরিপন্থী তা জানি। সেজদা বলেন, যোগপথে পা বাড়ালে নানা বাধা-বিপত্তি আসে শত্রু হয়ে, সে সব শত্রুর বিনাশসাধনই তো বীর্যবানের কাজ। বাইরের চিন্তা সব আসে ভিড় করে আমাদের আত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে। বুদ্ধি দিয়ে এ-সব বুঝি কিন্তু বুদ্ধিটা সুবুদ্ধি না হয়ে কখন যে কুঁকড়ে তুর্বুদ্ধি হয়ে থাকে তা বুঝতে পারি না। তুঃসহ জালায় ভিতরটা যেন জলতে থাকে!

মনে মনে বারীনদার মনোভাবকে ধরবার চেষ্টা করি। তাঁকে স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হয় না, তাঁর কথার সুরে বুঝতে পারি, তাঁর মনের গতি এখন কোন্ দিকে। বারীনদার সেই চিঠির কথা ব্যক্ত হয়ে ওঠে—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

এ রকম করে আর কত দিন চলে? পেট আছে এবং সে পেটে ক্ষুধার জ্বালাও আছে, সে জ্বালা নিবারণের জন্যে অর্থ চাই; সুতরাং বারীনদা এবার অর্থোপার্জনের দিকে মন দিলেন। এক বড় কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের "Integral Yoga" (পূর্ণ যোগ) সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখে পেলেন তিনশ টাকা। এইটাই হল এবার বারীনদার মূলধন। এইটুকু সম্বল নিয়ে বারীনদা মোহনলাল স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করে সংসার পাতার ব্যবস্থা করে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে এসে জুটলেন তাঁর যুবক বন্ধু দুটি। তাঁর মাথায় আরও পরিকল্পনা খেলছিল ইতিমধ্যে। কে টাকা দিয়েছিল জানি না। সেই টাকাতে তাঁর মৃত সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকাকে মৃতসঞ্জীবনী-সুরা দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আধ ডজন সহ-সম্পাদকের সাহায্যে কাগজ বার হতে লাগল। ঐ আধ ডজনের মধ্যে প্রবোধ সান্যালই তাঁর আসল সহায়ক। কাগজের পেট ভরাতে হলে অনেক খাদ্য দরকার এবং এ খাদ্য বেশির ভাগ জোগাতে পারে উপন্যাস। প্রবোধের প্রথম উপন্যাস 'কাজললতা' বার হতে লাগল ধারাবাহিকভাবে। গায়ক-কবি নলিনীকান্ত সরকারও টুকরো টুকরো সংবাদের উপর একটি করে ছোট্ট বেশ চটকদার মন্তব্য ছাড়তেন। প্রবোধ নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে বারীনদার বাসায় খাসা বাসা বেঁধে বসল। ইতিমধ্যে সরোজিনী দিদি (বারীনদার সহোদরা) এসেছেন, এসেছেন বারীনদার পালিকা মাতা। বারীনদা এঁকে ডাকতেন রাঙা মা বলে। রাঙা মা-ই বটে। বৃদ্ধার গায়ের রঙে ছিল যেন গিনি সোনার আভা, একা আসেন নি, এসেছেন একটি শ্বেতশুভ্র লোমশ কুকুর সঙ্গে করে। কী অসীম শ্রদ্ধা ছিল বারীনদার এই মায়ের প্রতি! নিজের মা উন্মাদিনী হওয়ার পর রাঙা মা-ই কচি দুটি শিশুকে (বারীন আর সরোজিনীকে) পালন করেছিলেন।

মৃতসঞ্জীবনী-সুরা বিজলীকে বাঁচাতে পারে নি। কিছুদিন তাঁর বিজলী চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে আবার চিরতরে চোখ বুজল। তারপর বারীনদার মাথায় এল নব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা। ম্যাকচুয়ারি ডেকে অনুষ্ঠান-পত্রও রচনা হয়ে গেল এবং ছাপাও হল। কিন্তু কল্পনাই সার, বাস্তব রূপ তার কোন দিন ফুটল না।

কিছুদিন বারীনদা রইলেন তাঁর বড়দা বিনয় ঘোষের পরিবারভুক্ত হয়ে।

সেখান থেকেও একদিন অকস্মাৎ রওনা হলেন সুদূর বেহালা অঞ্চলে তাঁর কৃষি-পরিকল্পনা সার্থক করতে। তাঁর ভক্ত যুবক-বন্ধু অমলকে এ বিষয়ে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। পানাভরা পচা পুকুর চারদিকে, ঘন বাঁশবন আর আগাছায় আচ্ছন্ন বড় বড় মাঠ। সেখানে সাপের উপদ্রব। বারীনদা সর্পবংশ ধ্বংস করার জন্যে বন্দুকের লাইসেন্স চেয়ে বসলেন সরকার বাহাদুরের কাছে। সরকার বাহাদুর বারীনদাকেই তখনও সর্পকুলের সগোত্র মনে করতেন। কখন্ যে ফোঁস করে উঠে ছোবল মারবে কে জানে? সুতরাং বন্দুকের লাইসেন্স আর হল না।

একদিন অতি উৎসাহভরে তাঁর ঘরের বারান্দার নিচে অঙ্গুলি নির্দেশে আমার দিকে চেয়ে বললেন—ঐ দেখ আমার 'কিচেন গার্ডেন'। দেখলাম গোটাকয়েক বেগুন গাছ একটু তাজা হয়ে উঠেছে, আর একটু দূরে এক ফালি জমিতে কয়েক ঝাড় পালং শাকের মাথা গজিয়েছে, তার পাশেই দুটি সারিতে লঙ্কার চারা। বারীনদার আনন্দ আর ধরে না। বললেন—যাবে মাঠে? সেখানে আরও কত কিছু।—কতকিছু দেখবার উৎসাহ আমার ছিল না।

একদিন খটাখট্ খটাখট্ করে খুশিতে হাসিভরা মুখ নিয়ে আর্য পাবলিশিং হাউসে উপস্থিত হয়ে বললেন—দেখেছ?

দেখলাম বারীনদার হাতে নতুন একটা বেতের চুবড়িতে গোটা পাঁচ-ছয় বেগুন—কাল কুচকুচে নয়, মাছরাঙা রঙের।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বৌদিকে উপহার দিতে যাচ্ছি, বলে সোল্লাসে কৃষিবিদ্যা-বিশারদ বারীনদা আর একটু শূন্যে তুলে ধরলেন চুবড়িটা, যাতে আমি ভাল করে দেখতে পারি।

মোটরটা অচল হয়ে গেল, ভাই। অমলিকে বসিয়ে রেখেছি। আমাকে ট্রামেই যেতে হবে। বারীনদা নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বারীনদার মোটর চড়ার সখ হয়েছিল। অমলির কল্যাণে তাও হয়ে গেল। দিনকতক নড়বড়ে ঐ জলের দরে কেনা পুরান মোটরখানা চলে ঐ যে অচল হয়ে গেল, তারপরে নাকি আর সচল হয় নি।

বারীনদার বয়েসটা যেন আর উপরে উঠতে চায় না। আমারই কোঠায় নেমে এসেছে। একসঙ্গে হলেই যেন দুটি যুবক কথা বলছে।

জিজ্ঞেস করি—বারীনদা, ধ্যানট্যান আজকাল কিছু করছেন?

ধ্যেৎ, ধ্যানের নিকুচি করেছে!

মনে মনে ভাবি—এই সেই বারীন ঘোষ! অগ্নিযুগের বহ্নিশিখা এমনি স্তিমিত! মহাশক্তির উপাসক যিনি চড়া পর্দায় সুর ধরেছিলেন—

—হৃদয় শ্মশান
নাচুক তাহাতে শ্যাম'!

বারীনদা কাশীতে বেড়াতে গেলেন একবার। সেখানে তাঁর যোগাযোগ সপুত্রক এক বিধবা রমণীর সঙ্গে। কলকাতায় তাঁদের মিলন পাকা হল রেজিস্ট্রী অফিসে।

বারীনদা এবার সত্যিকারের সংসারী হলেন। লোকে ধিক্কার দিতে লাগল। খবরের কাগজে যুগলের ছবি বার করা হল।

পণ্ডিচেরি থেকে নলিনীকান্ত গুপ্ত আমায় লিখলেন—

বারীনদাকে নিয়ে লোকে অত হৈ-চৈ করছে কেন বল তো? সন্ন্যাস নিলেও দোষ, আবার সংসার-আশ্রমে ঢুকলেও দোষ। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।

বারীনদা এখন থেকে চুটিয়ে সংসার করতে লাগলেন। সংসারের কলহ-কোলাহল, দিনান্তের নিশান্তের গ্লানি সবই গায়ে মেখে যান অসীম ধৈর্যসহকারে। দুঃখ হলেও দুঃখ তিনি বরণ করেছেন স্বেচ্ছায়, সুতরাং তার জন্তে তাঁর দুঃখ নেই। জীবনপ্রবাহ চলেছে, কোথাও আবিলতা ঠেলে, কোথাও বা সূর্যকরোজ্জ্বল তটভূমির ক্ষণিক স্নিগ্ধ শ্যামল স্পর্শ পেয়ে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় বারীনদার ছিল না। সমাজের কোন বন্ধনই তাঁকে বাঁধতে পারে নি। সবই যেন তাঁর সৃষ্টিছাড়া!

হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বারীনদা গেলেন হাসপাতালে। খবর পেয়ে একদিন দেখতে গেলাম তাঁকে। মুখে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটিয়ে বেদনা-কাতর কণ্ঠে বললেন—অ্যাঁ, এসেছ অধঃপতন দেখতে?

দুঃখ হলেও একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

ঐ দুর্ঘটনার আগে বারীনদা কিছুকাল দমদমে আমাদের পাড়াতেই বাসা করেছিলেন। দেখা করতে গেলে প্রায়ই তাঁকে দেখতাম কেমন যেন অন্যমনস্ক। প্রথমটা দশ-পনের সেকেণ্ড নীরবে মুখের দিকে চেয়ে যেন চমকে বলে উঠতেন—অ্যাঁ এসেছ! বিস্ময়ে ভাবি বারীনদার জীবন কি আবার উজান বেয়ে চলেছে! সংসার-আশ্রমের সকল তৃষার এবার নিবৃত্তি হল কি? দেব-মানবের স্বভাব কি হবে জানি না কিন্তু এই মাটির মানুষের স্নিগ্ধ কোমল হৃদয় যেন জড়িয়ে ধরতে চায়; অমিত শক্তির আধার এই চঞ্চল উদার, উজ্জ্বল

মানুষটির চরিত্রে বিচিত্র রসের সমাবেশ। ভুলতে পারি না আজও, একদিন বৈশাখের খররৌদ্রে দুপুরবেলায় তাঁর আর. জি. কর রোডের বাসা থেকে স্বয়ং ছুটে গিয়ে বাজার থেকে কোঁচড়ে করে ডিম কিনে এনে ত্বরিত ওমলেট তৈরি করে চায়ের সঙ্গে খাওয়ানোর কথা!

কিন্তু শেষের ডাক একদিন এল। তাঁর জীবন-বীণার সমস্ত তার ছিন্ন হয়ে গেছে শুধু একটি তার ছাড়া; সে তারে তখন যেন বাজছিল সুদূর এক আলোর তৃষার ক্ষীণ ক্রন্দন-ধ্বনি! শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে বারীনদা চেয়ে ছিলেন তাঁর ঘরে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের ছবির তাঁর প্রশান্ত, অতল দুটি ক্ষমাশীল চোখের দিকে। তাঁর দুই চোখের প্রান্ত থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে শুকিয়ে গিয়েছিল তাঁর গণ্ডদেশ।

৯

যেমন সাধারণত দেখি। আভূমিলুণ্ঠিত চুনোট-করা ধুতির অগ্রভাগ ধুলিধূসরিত, গায়ে শ্বেতশুভ্র পরিচ্ছন্ন পাঞ্জাবি। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী এলেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠবার সময় কোঁচার প্রান্তভাগ কোন দিন হাতে ধরতেন না। ঐটিই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সগোত্র। সগোত্র বলাটা বেশ খেটে যায়, কারণ উভয়েই ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আমি কিন্তু বলছি তাঁদের বিলাসিতার কথা। যদিচ সত্যিকারের বিলাসিতা বলতে যা বুঝায় তা জগদিন্দ্রনাথেরই ছিল, প্রমথ চৌধুরী তাঁর কাছে অনেকটা ম্লান। শুনেছি জগদিন্দ্রনাথ একদিন যে পোষাক-পরিচ্ছদ পরতেন তা আর দ্বিতীয় দিন তিনি অঙ্গে ধারণ করতেন না। ভাবতাম প্রমথ চৌধুরীও তো তাঁর পরনের ধুতিখানি কাল পরতে পারবেন না।

প্রমথ চৌধুরী অতি সুপুরুষ। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। যে-কোন পোষাকেই তাঁকে সুন্দর মানাত। কাজেই আমাদের মত সাধারণ লোকের কাছে তিনি ছিলেন বিলাসী। সাপ্তাহিক বিজলী অফিসে তাঁকে দেখেছি, দেখেছি ল কলেজ-ফেরতা। ল কলেজ থেকে ফিরতি মুখেই তিনি বেশির ভাগ আমাদের এখানে উঠতেন। তিনি ছিলেন ল কলেজের অধ্যাপক। ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি ও-কর্ম কোনদিন করেন নি। মুখ্যত তিনি সাহিত্য-চর্চা নিয়েই থাকতেন, তাঁর আর সব কাজ ছিল গৌণ।

এই সূত্রে তাঁর বিলাসিতার প্রতি কটাক্ষের কথা মনে পড়ল। তিনি ছিলেন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার প্রায় মাসখানেক পর তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যখন মির্জাপুর পার্কের (বর্তমানে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় তাঁকে দেখতে পেয়ে অপর ফুটপাথ থেকে তাঁদের ফুটপাথে এসে তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বললেন—

কি হে চৌধুরী, খুব বাবু সেজে বেরিয়েছ যে!

—হয়ত তাই।

—পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে, তা বোধ হয় জান।

—হাঁ, পণ্ডিতমশায় জানি।

—পাশ, না ফেল?

—পাশ।

তুমি পাশ!

—হাঁ, ফার্স্ট ডিভিশনে।

পণ্ডিতমশায় আর দ্বিরুক্তি না করেই অপর ফুটপাথে চলে গেলেন।

পণ্ডিতমশায়ের ধারণা ছিল বাবু ছেলেরা কোনদিন পাশ করে না। প্রমথ চৌধুরীর এই অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব তাঁকে ব্যথিত করেছিল। শুধু তাই নয়, উত্তরকালে এই বাবু ছোকরাই বি. এ. পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিলসফিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন। এম. এ. পরীক্ষায়ও তিনি ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

যাক গে সে কথা। এবার আসল কথা বলি। প্রমথ চৌধুরী এসেই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, প্রবোধ (প্রবোধ সান্যাল) আসে নি?

প্রবোধ তখনও আসে নি। কাজেই বললাম—না।

প্রমথ চৌধুরী শুরু করলেন—

বুঝেছ (এই কথাটির উচ্চারণ তাঁর মুখে শুনা যেত ব'ছো) প্রবোধের 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইটি আমার ভাল লেগেছে। বলো তাকে, আমি খুশি হয়েছি। আমার মনে হয়েছে এই লেখকের শক্তি আছে। ভাখ, শরৎ চাটুয্যে মশায়ের প্রথম গল্প আমি পড়ি 'অনুপমার প্রেম'। গল্পটি তিনি লিখেছিলেন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে। বলা বাহুল্য, তিনি এ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। গল্পটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম এবং লেখকের শক্তি দেখে

আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, এই লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ইনি বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবেন। আমার ধারণা যে মিথ্যা হয় নি, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। পুরস্কারের জন্যে লেখা গল্প, সুতরাং কুন্তলীনকে প্রাধান্য দিতেই হবে। শরৎবাবুও তা দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি তা দিয়েছিলেন যে, সত্যিই তারিফ করতে হয়। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য গল্প লিখেছিলেন। জানি না কবিগুরুর এটা হয়ত খেয়াল, কিংবা হয়ত তাঁকে দিয়ে এই গল্প লেখান হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইচ. বোসের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'দেলখোস' 'কুন্তলীন'-এর এক কালে খুবই নাম ছিল।

আজকাল তরুণ কথাটার খুব চলন দেখতে পাই। বর্তমানে যাঁরা লিখছেন তাঁদের এই বিশেষণে বিশেষিত করে ঠাট্টাঠুট্টি এবং গালাগালিও করতে দেখি অনেককে। বাংলায় 'তরুণ সাহিত্য' কথাটাও এসেছে এইভাবে। সাহিত্য সাহিত্যই; বয়সে যাঁরা তরুণ তাঁরা যে সাহিত্য রচনা করছেন তা তরুণ সাহিত্য নামধেয় হবে এ কেমন কথা? প্রবীণেরা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন, তাও সাহিত্য, আবার নবীনরা যা লিখছেন তাও সাহিত্য। দেখতে হবে শুধু উভয়ের লেখা সাহিত্য হয়ে উঠছে কিনা।

প্রমথ চৌধুরীর কথা এই—

সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ—আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কখন আর পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র তারই সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে অপরের মত হও, আর তার নিষেধ হচ্ছে নিজের মত হয়ো না। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম এতই ভয়াবহ যে, তার চাইতে পরধর্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায় আমরা আমাদের মনের সরস ও সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক।

অতঃপর বললেন—বুঝেছ, আমার ধারণা হয়েছে আজকাল আমাদের তরুণদের মধ্যে যাঁরা কলম ধরছেন, তাঁরা কিন্তু বকলমে কাজ সারছেন না।

নিজের আত্মার সঙ্গে পরিচয়ের বেগটা যেন এসেছে অনেকেরই। তাই তাঁরাও হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, আর চিন্তার ধারাও চলেছে নতুন নতুন পথ কেটে। এটা খুবই আশার কথা। আমি সত্যিই উৎফুল্ল হয়ে উঠছি। সমাজের একদল যাঁরা নিজেদের সেন্টিনেল বলে মনে করেন তাঁরা হতাশ হয়ে তারস্বরে চীৎকার করে বলছেন—গেল গেল সমাজ রসাতলে গেল। দুর্নীতির বন্যায় সব বুঝি ভেসে যায়, এই তাঁদের আশঙ্কা। অশ্লীল সাহিত্য অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে কি না তা বিচার করবার অধিকার সমাজের রুচিবাগীশদের থাকতে পারে না। সাহিত্যের ভাষা ঋজু সাবলীল এবং রসাল হওয়া চাই। আসলে সাহিত্যে রসসৃষ্টিই হচ্ছে মুখ্য, বাকিটা গৌণ। রসোপলব্ধির ক্ষেত্র হৃদয়, হৃদয় রসে বিগলিত হয় কি না দেখতে হবে শুধু তাই।

কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্য অশ্লীল এবং তাঁর রচনায় সুরুচি আহত হয়, এ অপবাদ বঙ্গসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নামেও শুনে থাকি। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে প্রায় দুশ বছর আগে। ভাবলে অবাক হই যে, ইংরেজ রাজত্বের শুরু হবার আগেও এই প্রতিভাবান লেখক কী অনন্যসাধারণ সাহিত্য রচনা করে গেছেন। ভাষার যেটা প্রসাদগুণ তা ভারতচন্দ্রে ফুটেছে যেন বনফুলের মত। অর্থাৎ সাজান বাগানের ফুল নয়, তা ফুটেছে আপনা আপনি প্রকৃতির কোলে আনন্দ-দোলায়। বিস্ময়ে মুগ্ধ হই, রসঘন হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ পাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য! সুন্দরের বিচারের জন্যে যখন তাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যা বলেছিলেন, তা শুনে কোন সমালোচক বলেছেন যে শ্বশুরের সঙ্গে এ ধরনের ইয়ারকি নাকি রুচিবিগর্হিত এবং তখনকার সমাজে এইটাই কি ছিল সুরীতি? তা যদি হয় তা হলে তিনি ভারতচন্দ্রকে সাহিত্যের রাজসভায় স্থান দিতে রাজি নন। সমালোচনার এই মাপকাঠি যাঁদের হাতে তাঁদের রসবোধের মাত্রা কতটুকু তাই ভাবি!

ভারতচন্দ্র আদিরস নিয়ে কারবার করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রস জন্মায় হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে অর্থাৎ এ রস বুদ্ধির খেলা, আর সে খেলা খেলায় মন। সাহিত্যে হাস্যরস যে অনেক সময় শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তার প্রমাণ খ্যাতনামা অনেক সাহিত্যরসিকদের লেখায় পাওয়া যায়। সাহিত্যের হাসি

শুধু মুখের হাসি নয়, এ হাসি মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

আর ত্থাখ, অনেকে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে আমাকে ভারতচন্দ্রের সগোত্র বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন, আমারও জন্ম ব্রাহ্মণকুলে। ভারতচন্দ্রের পিতা ছিলেন প্রায় রাজার তুল্য, আর আমারও পিতৃকুলের রাজৈশ্বর্য না থাক, ছিল প্রজাকুল এবং সেই প্রজাকুলের দৌলতে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কম ছিল না, এখনও আছে। এইটুকুই শুধু উভয়ের মিল। বাকিটা সবই গরমিল। রাজার ছেলে হয়ে জন্মালেও ভারতচন্দ্র তাঁর পিতার ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারেন নি। তাঁর অতি শৈশবকালেই তাঁর পিতা সর্বস্বান্ত হন। ফলে সারাজীবন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কী কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল তা যাঁরা তাঁর জীবনী পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন। বিদ্যাভ্যাস থেকে আরম্ভ করে সংসার-আশ্রম পর্যন্ত তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তা একটা ঘোর ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ এই ট্র্যাজেডিকেও তিনি হাস্যরসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এইটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য, এইটিই তাঁর প্রতিভার স্বরূপ।

ভারতচন্দ্র ও আমার সাহিত্য সৃষ্টির মাঝে আর একটা মিল সমালোচকদের দৃষ্টিতে পড়েছে। সেটা হচ্ছে আমরা বিলাসের কোলে মানুষ, সেই হেতু আমাদের সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য। ভারতচন্দ্র বিলাসী বিত্তশালীর ঘরে জন্মেও যে বিলাসের স্বাদ পান নি তার প্রমাণ আমি দিয়েছি সুতরাং তাঁর সাহিত্য যে বিলাসীর সাহিত্য এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। আমি কবুল করছি আমি বিলাসীর ঘরে জন্মেছি এবং বিলাসের সামগ্রী আমার যথেষ্ট। তাই বলে বিলাসী হয়ে আমি হাসতে পারব না এমন কোন কথা নেই। আগেই বলেছি হাসির উৎস হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। আমি যদি কিছু হাস্যরস বিলিয়ে থাকি তবে তা আমার বিলাসের দোষ নয়, দোষ বুদ্ধির। বলা বাহুল্য সাহিত্যের রসবিচারে এইসব অবান্তর কথার কোন অর্থ নেই।

আমার মনে হয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আকাশে ভারতচন্দ্র এক মহান জ্যোতিষ্ক এবং তাঁর জ্যোতি সুদূরপ্রসারী। কালের কষ্টিপাথরে আমরা খদ্যোৎকুল। ক্ষণিক আলোর ক্ষণিক দীপ্তি দিয়েই নিবে যাব। কিন্তু ভারতচন্দ্র চিরভাস্বর এবং আমার মতে অমর।

প্রমথ চৌধুরীর মুখে ভারতচন্দ্রের প্রশস্তি শোনবার পর আমি তাঁকে

বললাম—আপনি নিজেকে যত দীন সাহিত্যিক বলেই প্রচার করুন না, আমরা কিন্তু তা মনে করি না। আপনি শুধু বাংলা ভাষাভাষীই নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষীদের নিয়েও এত হাসাহাসি করেছেন যে, সে হাসিতে ফুটেছে রসের সঙ্গে কষ; উঠেছে অমৃতের সঙ্গে গরল। বীরবলী ঠাটের ঠাট্টাঠুট্টি কি সাহিত্যের দিক দিয়ে কম দামি? আর একদিক দিয়ে আপনি তো আমাদের গুরু পথিকৃৎ। আমাদের কথা ভাষাকে আপনি জাতে তুলে নিয়ে কুলীন করে ছেড়ে দিয়েছেন।

—হাঁ, তা যদি করে থাকি তো তার জন্যে আমাকে বেগ পেতে হয়েছে যথেষ্ট। আমার অপরাধ আমি নাকি শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করে ছেড়েছি। পুরান 'সবুজপত্র' যদি ঘাঁট্‌তো তো তাতে দেখতে পাবে যে, সব পালোয়ানের দল 'আও তো চৌধুরী এক প্যাঁচ লড়া দেই' বলে রীতিমত তাল ঠুকছেন। আমিও পিছপা হই নি, লড়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হয়েছে।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। স্বয়ং কবিগুরু পর্যন্ত আপনার পথ অনুসরণ করেছেন।

—আমি অসাধু ভাষাকে সাধু বানিয়েছি ভাষার গতিকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। আমি 'তাহার' পরিবর্তে তার লিখি অর্থাৎ সাধু সর্বনামের হৃদয়ের হা বাদ দিই। 'হায়' 'হায়' বাদ দিলে যে বাংলায় পদ্য হয় না, তা জানি; কিন্তু হা হা বাদ দিলে গদ্য হয় না, এ ধারণা আমার কোন দিন ছিল না।

—তা ছাড়া আপনার হাস্যরসেও বাহাদুরি আছে। একটা হাসির খোরাক জোগাতে যেখানে নাক ঘুরিয়ে দেখাতে হত সেখানে আপনি মাত্র দুটি শব্দ ব্যবহারেই কিস্তিমাৎ করেছেন। আপনার ভাষার রূপ স্বতন্ত্র, লেখার রীতি অনন্য। এর প্রভাব পড়েছে অনেক সাহিত্যিকের ওপর।

—আমার হাসিতে যদি কিছু বাহাদুরি থাকে তবে আমি তার জন্য ঋণী কৃষ্ণনগরের কাছে। বুঝেছ, আমি কিন্তু আসলে পদ্মাপারের বাঙাল। তবে আমার শৈশব এবং যৌবনেরও কিছুটা কাল কেটেছে কৃষ্ণনগরে, সেই হিসেবে আমি কৃষ্ণনাগরিক। হ্যাঁ, তোমার বাড়িও তো কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি জানি। আমার শিক্ষার বনিয়াদ ঐখানেই। আমি ভাষাও শিখেছি ঐখানে, কৃষ্ণনাগরিকদের মুখের ভাষায় এমন লালিত্য ফুটে ওঠে যা বাংলাদেশের অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। আর, তাদের কথা বলার ভঙ্গীও মধুর। যে কোন কথাকে মোচড় দিয়ে তারা তার থেকে হাস্যরস নিঙড়ে বার করতে জানে। আমার মনে হয়, এই

হাস্যরসের চর্চা তারা বহুকাল থেকে করে আসছে, তাই এ-রস তাদের সহজাত। তা ছাড়া ওখানকার সমাজের সব স্তরের লোকের সঙ্গেই মিশে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, বাংলার কালচার বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম ঐ অঞ্চলেই অর্থাৎ নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরে। আমার লেখায় আমি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছি যেগুলি সাহিত্যের ভাষায় অচল ছিল, ফলে আমার শব্দের পুঁজিও বেড়ে গেছে।

আমি যে সঙ্গীত-ছুট নই তার কারণ আমার কৃষ্ণনগরে বাস। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ার সময় একবার বেশ কিছুদিন রোগে ভুগে পড়াশুনায় বিশেষ কিছু মন দিতুম না। ঘুরতুম গান-বাজনার আড্ডায় আড্ডায়। তাতে করে আমার সুর-তাল-মান বুঝবার কান তৈরি হয়েছিল। আমি গাইয়ে-বাজিয়ে নই, হবার চেষ্টাও করি নি কোন দিন, যদিচ সঙ্গীতকলায় আমার নেশা ছিল প্রচুর। কৃষ্ণনগরে এই কলার চর্চাও বেশ হত। কৃষ্ণনগরের মহারাজার সেতার-শিক্ষক বাদ্রি মুকুলকে একদিন খুঁজে বার করলুম। কারণ মার্গ সঙ্গীতে তার হাত নাকি অপূর্ব। আমাদের বাসায় একদিন সকাল বেলা বাদ্রি মুকুল ভৈরবী বাজালেন, তা শুনে আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। সঙ্গীত আমাকে এমনই বিশেষভাবে বিচলিত করত। এই মুকুলজি পরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেও সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন আমার স্বমত থেকে শত বাধা সত্বেও আমি কখন বিচ্যুত হই নি, সামাজিক ব্যাপারেও তেমনি আমার দৃঢ় মত কেউ টলাতে পারে নি। আমার চরিত্রের এই দৃঢ়তা আমার পৈতৃক দান। বড়দা (আশু চৌধুরী) পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে সমাজে নেওয়ার কথা উঠেছিল। বাবা তাতে বাধা দিয়েছিলেন এবং এই নিয়ে নাটোরের রাজ-পরিবারের সঙ্গে আমাদের শুধু মনান্তর নয়, মতান্তরও দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল।

আমি বিলেত থেকে ফিরে আমাদের হরিপুরের বাড়িতে গিয়েছিলুম সকলের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে ঢুকতেই দেখি সব দিকে কেমন থমথমে ভাব। হরিপুর বলতেই বুঝাত চৌধুরী পরিবারের রাজ্য যেন। আমাদের পিতৃকুল মাতৃকুল দুই-ই এর চৌহদ্দির মধ্যে বাস করত। চৌধুরী বংশের মেয়েদের তখন বিবাহের পর বাপ-মাকে ছেড়ে কোন মগের মুলুকে যাবার প্রয়োজন হত না। চৌধুরীদের চৌহদ্দির মধ্যেই তারা বাসিন্দা হয়ে যেত।

আমার পিসিমার সঙ্গে প্রথম দেখা। আমাকে দেখেই বারান্দা থেকে লাফ

দিয়ে উঠে একটা শোবার ঘরের দরজার দুই চৌকাঠ দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। পাছে আমি ঘরের ভিতর ঢুকি এই জন্যই বোধ হয় ঐভাবে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁর কথাবার্তায় স্নেহ-ভালবাসার কোনই আহ্বান ছিল না। তিনি বোধ হয় মনে করেছিলেন এই আপদটা যত শীগ্‌গির বিদায় হয় ততই মঙ্গল। চৌধুরী-লাহিড়ী-বাগচি সবারই মনে যেন আতঙ্ক। তার আভাষ যেন বাতাসে ভেসে এল। আমি পিসিমার সঙ্গে দু-চারটি কথা বলেই সেই যে সেদিন বাড়ি থেকে বিদায় নিলুম আর জীবনে ও বাড়িতে ঢুকে কারও শুচিতা নষ্ট করি নি।

বিলেত গেলে জাত যায়—এই কুসংস্কার আমাদের হরিপুরের দুই কূলে সমান ছিল। তাঁদের দোষ দিতে পারি না, কারণ সংস্কার কি সহজে মরে? বাবা হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন, কাজেই তিনি এসব সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন; তিনি নিজেকে Enlightened Hindus দের দলে ফেলতেন।

আগেই বলেছি প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত মজলিসি লোক ছিলেন—যাকে আমরা সাধারণত বলি রীতিমত আড্ডাবাজ। অসহযোগের গোড়ার দিকের আন্দোলনে বারীন ঘোষের সম্পাদিত বিজলী সাপ্তাহিক পত্রিকা ঐ আন্দোলনের মারাত্মক দিকটা অতি মারাত্মক ভাবেই উদ্‌ঘাটন করে ধরত। হাস্যরসের ভিতর দিয়ে তীব্র সমালোচনা সত্যই উপভোগ্য ছিল এবং এই হাস্যরসের তলোয়ার প্রধানত খেলতেন 'ঊনপঞ্চাশী'র বিখ্যাত লেখক উপেন বাঁড়ুজ্যে। বৌবাজারে চেরি প্রেসের সম্পাদকগোষ্ঠীর আড্ডায় প্রমথ চৌধুরী প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। বিজলীর অন্তর্ধানের পর তাঁর শুভাগমন হত আমাদের এই বৈঠকেই বেশি।

একদিন আমাদের বৈঠকে তাঁর শিক্ষক জীবনের এক অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেছিলেন। তিনি ল কলেজের অধ্যাপক থাকাকালে আইনের উপাধি পরীক্ষায় অনেকগুলি ছাত্রের পরীক্ষার খাতা তাঁর হাতে পড়ে। তার মধ্যে একখানি খাতা ছিল ভারি মজার। সেখানিতে কালির আঁচড় যেটুকু পড়েছিল সেটুকু শুধু একটা করুণ আবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়। ছাত্রটি মুসলমান। সে তার আবেদনে জানিয়েছে যে, এর আগে আরও ছবার সে পরীক্ষা দিয়েছে, ছ-বারই ফেল। এইবার তার শেষ চেষ্টা, অর্থাৎ বার বার সাতবার। এবারও যদি সে ফেল করে তবে তার আত্মীয়-পরিজনের কারও কাছে তার মুখ দেখাবার

উপায় নেই। এ অবস্থায় স্যার যেন তাকে দয়াপরবশ হয়ে পাশ করিয়ে দেন। নইলে হয়ত তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। স্যারের দয়া ঠিকই হয়েছিল আর একটা রবার্ট ক্লসের সাক্ষাৎ পেয়ে। ছাত্রটির কাছ থেকে এই সন্দেশ পেয়ে তাকে গোল্লা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আমি করতে পারি নি। আইনের কথা দু-তিন পৃষ্ঠায় যদি কিছু থাকত তবু না হয় চেষ্টা করে দেখতুম কি করতে পারি। বেচারি! আত্মহত্যা করেছে কিনা জানি নে, আমি কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করতে পারি নি।

এক মাসিক পত্রের দলে একব্যক্তি ছিলেন যাঁর প্রমথ চৌধুরীর প্রতি আক্রোশ ছিল। আক্রোশের কারণ প্রমথ চৌধুরী ঐ ব্যক্তির একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন। এই সমালোচনাটি সম্পূর্ণ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অত্যন্ত ভদ্রভাবে লিখিত। তাতে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের বহু বক্তব্যের মধ্যে সারবস্তু যে কি তা তিনি খুঁজে পান নি। প্রমথ চৌধুরীর অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করতে না পেরে উক্ত প্রবন্ধলেখক কিছুকাল পরে প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনকেই একবারে আক্রমণ করে বসলেন। অবান্তর অনেক কথাই তিনি ওই মাসিক-পত্রে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সংযোগ করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, এতকাল প্রমথ চৌধুরী যে সাহিত্য রচনা করেছেন তা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম হয়েছে। বীরবলের বিদ্রূপ নাকি চুটকি ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কোনই ছাপ নেই। আর প্রমথ চৌধুরী 'পদচারণ' 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রভৃতি কবিতার বই লিখে কবিপদ লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা যে কেন পোষণ করেছিলেন তাও উক্ত লেখক মশায় বুঝে উঠতে পারেন নি। সমালোচক মশায়ের লেখার মধ্যে তাঁর গায়ের ঝাল ঝাড়া ছাড়া আর কোন সারবস্তু তিনি দিতে পারেন নি। আমরা অনেকেই সে সময় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম। প্রৌঢ় বয়সে প্রমথ চৌধুরীও এই অযৌক্তিক আক্রমণে হয়ত কিছু ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যথার কোন প্রকাশ দেখি নি কোনদিন। শনিবারের চিঠিতে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পরেও তিনি আমাদের বৈঠকে আসতেন প্রায়ই। ঐ বিষয়ের উল্লেখ তাঁর মুখে শুনি নি কখনও এবং আমরাও ও-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকতাম। প্রমথ চৌধুরী অনেক পোড়-খাওয়া লোক, তাই ঐ তুচ্ছ আক্রমণের তাপ তাঁর গায়ে লাগে নি।

আমি কৃষ্ণনাগরিক বলে হয়ত প্রমথ চৌধুরীর আমার প্রতি কিছুটা দৌর্বল্য ছিল এবং সেই হেতু আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও কিঞ্চিৎ হয়েছিল। এ

ঘনিষ্ঠতার আর একটা কারণও হয়ত ছিল। তাঁর বইগুলির পাঠক ছিল কিন্তু বইয়ের বাজারে তাঁর গ্রাহক ছিল নগণ্য। তাঁর বীরবলের হালখাতা, চার-ইয়ারি কথা, আষাঢ়ে গল্প, পদচারণ, সনেট পঞ্চাশৎ ইত্যাদি বই আমাদের এখানে জমা দিয়ে বললেন—দেখ বাজারে কাটে, না পোকায় কাটে। অনেকদিন তাঁর মে ফেয়ার রোডের বাড়িতে আমাকে চা-এর নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন আর তাঁর খোস গল্প শুনে আনন্দ পেতাম। তিনি ফরাসি ভাষা জানতেন এবং ফরাসি সাহিত্যের খুবই অনুরাগী ছিলেন। অবিশ্যি বিনয় করে বলতেন তাঁর চেয়ে ঢের ভাল ফরাসি জানেন তাঁর পত্নী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, ইন্দিরা দেবী বি. এ. পাশ করেছিলেন ইংরাজি ও ফরাসি নিয়ে, যদিও ইংরাজিতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, একবার তিনি এক দুষ্কার্য করেন একটা ফরাসি গল্পের বাংলা অনুবাদ করে সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করে। গল্পটির নাম দিয়েছিলেন তিনি ফুলদানি। মৌলিক রচনা Proper Merimee-র 'Etruscan vase' রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি পড়ে প্রমথ চৌধুরীকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে, এই রকম একটা গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হয় নি, দ্বিতীয়ত, গল্পটি যাই হক, কাঁচা হাতের বাংলা অনুবাদে পাকা লেখকের লেখা শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অভিযোগ প্রমথ চৌধুরী মেনে নিয়েছিলেন, প্রথমটা মানেন নি।

প্রমথ চৌধুরীর হাতের লেখা অত্যন্ত বিশ্রী ছিল—যেমন ইংরাজি, তেমনি বাংলা। আমরা অতি বিনয় করে তাঁকে এ কথা জানাতাম।

একদিন বললেন তিনি—তোমরা বলবে কি, আমি তা ভাল করেই জানি সুতরাং অকপটে স্বীকার করছি। বুঝেছ, সবুজ পত্র যখন বার করতুম তখন কোন কম্পোজিটর আমার লেখা ধরতে চাইত না। গোড়ার দিকে এত ভুল ছাপা হত যে নিজেরই লজ্জা হত। বকাবকি করে কোনই ফল হল না যখন, তখন মেজদা (যোগেশ চৌধুরী) তাঁর সম্পাদিত Calcutta weekly Notes-এর অফিস থেকে এক কম্পোজিটর ঠিক করে দিলেন। একমাত্র এই লোকটিই আমার লেখা নির্ভুল কম্পোজ করতে পারত। বিপদ হত যখন এই লোকটি কোন কারণে অফিসে অনুপস্থিত হত।

একদিন অন্য এক পরিবেশে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। সে কথাই বলছি—

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের প্রথম নাচ দেখতে গিয়েছিলাম নিউ এম্পায়ারে। অগণিত লোকের মধ্যে সেদিন প্রমথ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। নাচ শেষ হলে নিচে এসে রাস্তার উপরে দাঁড়াতেই দেখি প্রমথ চৌধুরী এলেন। আমাদের উভয়ের দেখা হতে আমরা তাঁর মোটরের পাশে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারও মুখে কোন বাক্যস্ফূর্তি নেই। একটা নিস্তব্ধ জনতার মিছিল যেন চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত থমকে থেমে গেছে। মোটরগামীদের মোটরে ঢুকবার সময় দরজা খুলতে গিয়ে দুটি হাত যেন অচল হয়ে রয়েছে। দূরে চৌরঙ্গির রাস্তায় যান-বাহনের শব্দ ভেসে আসছে কানে। এ যেন হিমাচলের কোন গভীর জঙ্গলে ঢুকে প্রশান্ত বন-বীথিকায় চলবার সময় ঝরা পাতার স্পর্শে নিজেরই পায়ের মর্মর-ধ্বনি!

পথ-চলতি আমাদের এক পরিচিত বন্ধু আমাদের উভয়কে দেখতে পেয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রমথ চৌধুরীকে উদ্দেশ করে বললেন—আপনার সদ্য প্রকাশিত 'নীললোহিত' পড়লুম। প্রমথ চৌধুরী তাঁর দিকে তাকালেন বটে কিন্তু কোন কথাই বললেন না। মন তাঁর কোথায় উড়ে গিয়েছিল কে জানে! নাচ দেখে এসে তখনও তাঁর নেশা কাটে নি। তাঁর স্তব্ধতায় বিস্মিত হয়ে বন্ধুটি আহত হলেন কি না জানি না। তিনি আর অপেক্ষা না করে আবার পথ চলা শুরু করলেন।

দরজার হাতলে হাত লাগানো দেখে প্রমথ চৌধুরীর ড্রাইভার হয়ত মনে করল তার মনিব দরজা খুলতে পারছেন না, তাই এগিয়ে এসে দরজাটি খুলে ধরল। যন্ত্রচালিতের মত মোটরে ঢুকে গলা বাড়িয়ে আমাকে বলে গেলেন—বুঝেছ, শশাঙ্ক, আমার মনে হয়েছে, এর পরে কোন মেয়ে মানুষের আর নাচা উচিত নয়।

১০

নাদির! নাদির!

কবি মোহিতলাল মজুমদারের কণ্ঠের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। পাশের ঘরে বরোদা এজেন্সিতে স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি করছিলেন তিনি। তাঁর আবৃত্তি অনেকবার শুনেছি। স্বর্গীয় কবি যতীন বাগচির মৃত্যুর পর তাঁর এক শোকসভায় বাগচি-কবির কয়েকটি কবিতা মোহিতলাল অতি চমৎকার আবৃত্তি করেছিলেন।

বরোদা এজেন্সি থেকে 'কালিকলম' প্রকাশিত হত। সেখানে মাঝে মাঝে আসতেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর মামা সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 'চিত্রবহা'র লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। ও-ঘরে আসাই মানে আমাদের ঘরেও আসা। দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান মাত্র একটি দেওয়াল।

বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ভাষায় কবিতা লিখতেন মোহিতলাল। তাঁর শব্দসম্ভার গাঢ়পিনদ্ধ ছন্দের বাঁধনে ঝংকৃত হয়ে উঠত। একটা ক্লাসিকের সুর যেন পেতাম তাঁর কবিতায়।

সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দর ছোটগল্প লিখতেন। 'কালিকলম'-এ তাঁর অনেকগুলি ছোটগল্প বার হয়েছিল। বেঁটে-খাটো মানুষটি, তাঁর হাতের অক্ষরগুলিও ছিল খুদে কিন্তু বেশ ঝরঝরে, পরিচ্ছন্ন। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের জীবন-যাত্রার অনেক মজার মজার গল্প শুনতাম তাঁর কাছে।

মোহিতলাল কলকাতায় ইস্কুল মাস্টারি করতেন।

অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন মোহিতলাল। প্রচুর পড়াশুনা করতেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ড. সুশীল দে তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐখানে অবস্থানকালে মোহিতলালের প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল অনেকখানি। একবার এক মাসিক পত্রে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যে তাঁর রসবোধের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেগুলি আমাদের এখান থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁকে জানাতে তিনি ঢাকা থেকে একদিন এসে আর্য পাবলিশিং হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন।

বললেন—আপনার তো সাহস কম দেখছি না মশায়। আপনি প্রবন্ধের বই ছাপতে চান? আদর্শের কথা ছেড়ে দিন, আপনার কোন ব্যবসা-বুদ্ধি আছে বলে আমার মনে হয় না। বইয়ের ব্যবসা করে লোকে দুটো পয়সা পাবার আশায়। এদেশে এক গল্প-উপন্যাস ছাড়া কেউ প্রবন্ধের বই পয়সা দিয়ে কেনে?

ভদ্রলোকের প্রবন্ধের বই ছাপা হবে, তাতে তাঁর উৎফুল্ল হবার কথা। তা নয়, তিনি আমাকে যেন নিরুৎসাহই করলেন।

যে কোন কারণেই হোক, তাঁর সে প্রবন্ধের বই আমাদের এখান থেকে ছাপা হয় নি।

আমাদের হেম বাগচি ছিল মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয়। সেও ইস্কুল-

মাস্টারি করত এবং কবিতা লিখত। ঐ যা বলেছি, মাস্টারিতে সংসার চালান কঠিন। উপরন্তু বিয়ে করে বসেছিল, সুতরাং বোঝা ভারি হয়ে উঠেছিল। তাই আয়বৃদ্ধির জন্তে পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসা করবে বলে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটি ছোট্ট দোকান খুলে বসল। কবির পক্ষে ব্যবসা চালান সম্ভব কি না তা সে ভাবে নি। প্রথমেই বিখ্যাত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা-সংগ্রহ সে বার করলে 'শতনরী' নাম দিয়ে। তারপরে নিজেরই লেখা ছেলেদের একখানা কবিতার বই 'ছন্দের টুংটাং' ছেপে ফেললে। ভাল কবিতার বই হলেই যে ভাল পাঠক মিলবে—একথা তখন যেমন কেউ হলফ করে বলতে পারত না, এখনও তেমনি পারে না।

কিছুদিনের মধ্যেই হেমের ব্যবসা পটল তুলল এবং সেই সঙ্গে তার এমন একটা পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেল যে, যে-কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। আমি সেই সময়কার কথা বলছি।

মোহিতলাল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক: হেম ও মোহিতলাল উভয়ের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান ছিল। মোহিতলাল একখানি সুদীর্ঘ চিঠি একবার লিখলেন হেমকে। ঐ চিঠিখানি সে প্রথমে আমাকে পড়তে দিয়েছিল, তারপর আমাদের বৈঠকেও ঐ চিঠি পাঠ করে শোনান হয়।

চিঠিখানি আমার কাছে খুবই মূল্যবান মনে হয়েছিল, কারণ ওখানি সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ। আমি তার কিছু কিছু অংশ তুলে নিজের কাছে রেখেছিলাম। পরে অবশ্য সমগ্র চিঠিখানিই আমাদের বন্ধু সুরেশ চক্রবর্তী কাশী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'উত্তরা' মাসিক পত্রে 'রস-রহস্য' নাম দিয়ে ছেপেছিলেন।

হেমের তখন নৈরাশ্য-পীড়িতের অবস্থা। কাব্য-সাধনার সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধিকে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে এমন বিমর্ষ হয়ে গেল যে, তাকে দেখলে সত্যিই কষ্ট হত।

আজকালকার দিনে কবিমাত্রকেই দ্বিপত্নীক হতে হবে—এক-পত্নীব্রত এখন অসম্ভব যে, তা না পারলে কোন পত্নীই তার ঘরে থাকবে না। বিষয়-বুদ্ধি ও কবিকল্পনা এ দুয়ের মিলন না হলে কবি-জীবন দুর্বহ হয় বলেই আজকালকার কবিতায় রস অন্তরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে—কাব্যেও এই বণিক-কন্তাকে রানির আসনে বসাবার জন্তে আধুনিক কবিকুল কল্পনাকে কেটে-ছেঁটে বেনে-বৌ সাজিয়ে এত ঘটা করে Realism-এর গৌরব কীর্তন করছে।

'বিস্মরণী'র কবি মোহিতলাল তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে হেমকে

সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, আধুনিক জীবনে 'রস' জিনিসটা এখন আস্বাদনের বস্তু না হয়ে চর্বণের বস্তু হয়েছে, কাব্যে চর্বণযোগ্য অস্থিখণ্ড থাকা চাই—পৌরুষ না থাক, চাই স্বাদ-বৈচিত্র্য। বলেছেন, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি স্বয়ং। অর্থাৎ কাব্যের রসবিচারে তিনি অতি আধুনিক হতে পারেন নি বলেই যে দুঃখভোগ করেছেন, এ কথা প্রকারান্তরে হেমকে জানিয়ে দিলেন।

সাংসারিক জীবনে মোটামুটি একটা সচ্ছলতার মান বজায় না রাখতে পারলে যে বিপর্যয় ঘটে এবং সেই বিপর্যয়ের ঘাত প্রতিঘাতে সংযমের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওর মধ্যে যারা স্থিতধী তাদের কথা স্বতন্ত্র।

ঢাকার অধ্যাপক-জীবন মোহিতলালের মোটামুটি ভালই চলছিল। একটানা সুখভোগ কারুর জীবনেই হয় না। মাঝে মাঝে এক-একটা ধাক্কা আসে যা মানুষকে তার চৈতন্যের একটা ধাপে পৌঁছে দেয়, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়, সমীক্ষাও হয়ত এসে যায়।

কিছুদিন বিরহভোগের পর মোহিতলালের স্ত্রী-পুত্র সব বাসায় ফিরেছে। অনেকদিন নিঃসঙ্গ অবস্থার পর এই পুনর্মিলনে তাঁর প্রাণটা যেন একটু সুস্থ বোধ করছিল, ঠিক এমনি সময় তিনি এক ধাক্কা খেলেন। এই ধাক্কার কথাই তিনি তাঁর চিঠিতে হেমকে জানিয়েছেন—

প্রাচীন মিশরবাসীদের সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে, যখন তারা উৎসব-রজনীর ভরা সুখভোগে উন্মত্ত হয়ে উঠত, তখনই সেই ফুল, আলো, গান রূপ-যৌবন ও মদস্রোতের মধ্যে হঠাৎ একটা 'মমি' তাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল। জীবনের এই ভোগ-সৌন্দর্যের অন্তরালে যে বীভৎস কঙ্কাল লুকিয়ে আছে, সেটা যেন বিস্মৃত না হয়, তারই জন্য এই আয়োজন। আমিও শ্মশানে শবাসনে বসে যে সৌন্দর্য-কল্পনায় বিভোর থাকবার চেষ্টা করে এখন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়ছি—তাকে আরও ধাক্কা দেবার জন্যেই যেন একটা নতুন বিভীষিকা, একটা মর্মভেদী অট্টহাস, আমার সামনে সহসা ফুটে উঠল। কাল আমার এখানে এক পাগল এসে অতিথি হয়েছিল।

ঐ পাগলটি ছিলেন এককালে মোহিতলালের ইস্কুলে সতীর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করার পর কিছুদিন মোহিতলালের সঙ্গে একই ইস্কুলে কাজ করেছিলেন। সৌম্যদর্শন, ধীর, সহৃদয়, শিক্ষিত যুবক। স্বভাবটা ছিল কিছু চাপা। বুদ্ধি ও রসবোধ এবং সেই সঙ্গে একটি পরিমাণবোধ ছিল, আর ছিল একটি স্নিগ্ধ সংযম ও সৌজন্য।

একদিন শোনা গেল ঐ যুবকটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে এবং কোথায় যেন নিরুদ্দেশ।

ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তিই পাগলের বেশে মোহিতলালের দ্বারে উপস্থিত। শুধু একটা রাত্রির জন্য অতিথি হতে চায়। জিজ্ঞেস করলে মোহিতলাল তাকে চিনতে পেরেছেন কি না। চিনতে তাকে মোহিতলাল ঠিকই পেরেছিলেন, কিন্তু এ কী তার চেহারা! কৌপীনের চেয়ে কিছু বড় এক টুকরা ধূলি-মলিন কাপড় হাঁটুর খানিক উপর পর্যন্ত কোনও রকমে জড়ান; গায়ে অতিশয় মলিন একটা খদ্দরের ফতুয়া, একটা প্রায়-নতুন ছাতা, তার হাতলে বাঁধা একটা এল্যুমিনামের ঘটির মত ছোট হাঁড়ি ও একজোড়া বহু পুরাতন ছিন্ন জলসিক্ত চটি; কোমরে একটা দড়ির সঙ্গে পিঠের দুইটি ছোট ও বড় পুঁটলি বাঁধা; মাথার চুল খুব ছোট করে ছাটা, ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা দাড়ি, আর চোখে সেই চশমা। কিন্তু সেই কণ্ঠ, সেই কথা বলার ভঙ্গি এবং শীর্ণ মুখে সেই সরল বুদ্ধির আভাস। কেবল ক্লান্তি, অবসাদ ও একটা নিরভিমান ঔদাসীন্যের ছায়া যেন তার ওপর পড়েছে।

মোহিতলালের দুটি ছেলে এখন জ্বরে আক্রান্ত; উপরন্তু তাঁর বাড়িতে তাঁর এক আত্মীয়-দম্পতি অতিথি। তাঁদের জন্য তাঁর পড়বার ঘরখানাকে শোবার ঘর করা হয়েছে। এক ঘোর সমস্যা এবং এই সমস্যা আরও ঘোরতর এই জন্য যে, নবাগত অতিথি পাগল। তবু মোহিতলাল এই পাগলের একরাত্রি বাসের ব্যবস্থা তাঁর বাসায় কোনও রকমে করে দিয়েছিলেন। পাগলকে প্রশ্ন করে তিনি জানলেন সে কেবলই ঘুরে বেড়ায়। পায়ে হেঁটে সারা পশ্চিমাঞ্চল ঘুরে এখন বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যাত্রার কোন উদ্দেশ্য নেই—সংসার ও সংসার-চিন্তা বিমুক্ত হবার এই নাকি একমাত্র উপায়।

পাগলের মা আছেন, বড় এক ভাই, ছোট এক ভাই আছে। পাঁচ মামা আছে। স্ত্রী থাকে তার মার কাছে মামার বাড়িতে।

মোহিতলাল লিখছেন—

কিন্তু এই পাগল তাদের কারও কাছে থাকার চেয়ে এমনি পথে পথে অপরিচিত অনাত্মীয়ের দ্বারে এক বেলার জন্য অতিথি হয়ে, যতদিন পারে এই জীবন বহন করে চলেছে। দুইদিন কেন, দুই বেলাও কোথাও থাকা, মানুষকে পীড়িত করা—এই রকম একটা বিশ্বাসে সে কোনখানে বিশ্রাম করতে পারে না, ক্রমাগত পথ অতিবাহন করছে। পায়ে শক্তি থাক বা না থাক, শরীর অবসন্ন হোক, তবু সে চলেছে। একবেলা আহার, কখনও বা জোটে না—আশ্রয়

কোনখানেই প্রায় জোটে না, তার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ নেই ; গভীর রাত্রে, পথের ধারে, গাছতলায়—বা বর্ষার দিনে, কোন একটা বারোয়ারি ছাউনির তলায়—সে নিশ্চিন্ত নিদ্রা উপভোগ করে। একমাত্র নেশা বা সুখ—নিত্য-নতুন দেশ পল্লী শহর পাহাড় নদী দেখা, এবং মানব-সঙ্গহীন নির্জনতার উপভোগ। কিন্তু এই নিরন্তর পথ চলার পরিশ্রম আর বেশিদিন সে সহ্য করতে পারবে না— এখনই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি যদি বলি, তবে দুই চারদিন বিশ্রাম করতে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু সে তা কখনও নিজে বলবে না—মানুষের উপর ওই একটুখানি একদিন আতিথ্যের দাবি ছাড়া, আর কিছু করবার প্রবৃত্তি বা সাহস তার নেই। আমিও অনেক কারণে তাকে সে অনুরোধ করতে পারলাম না—না পেরে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, আজ এখনও।

... ...

পাগল একবার বললে—আমি সবাইকে সরলভাবে বিশ্বাস করতাম—সকলের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল সেই ধারণাই সত্য বলে মনে করতাম—পরে জেনেছি সেটা আমারই ভুল, আমারই দোষ। ঘুরে বেড়াচ্ছি—দেখি যদি একটাও আমার ধারণামত মানুষ চোখে পড়ে। আপনাকে খুব প্রাণখোলা লোক বলে জানতাম, তাই বড় আহ্লাদ করে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে এলাম। কিন্তু সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছে। সে মানুষ সম্বন্ধে সরল শিশুর মত ধারণা পোষণ করে, তাই কি একদিন হঠাৎ যখন তার চোখের সামনের সেই পর্দা উঠে গেল, সেইদিনই সে পাগল হয়ে গেছে ?

... ...

পাগল নিশ্চিন্ত হতে চায়, কোনও চিন্তা তার সহ্য হয় না। জীবন-মৃত্যু, মানুষ-ভগবান—কোনও তর্ক বা প্রশ্নই তার রুচিকর নয়। তার পকেটে একখানা 'গীতা' আছে, কিন্তু ভগবানের উপর তার নির্ভরতার কোন প্রমাণ পেলাম না। তার মনের কোন্‌খানটা বিকল হয়েছে, তা ঠিক করা শক্ত। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন আত্মীয়ের দুর্ব্যবহার কি তার প্রাণে আঘাত করেছে ? তার উত্তরে সে বললে—তাদের আর দোষ কি ? বললাম—সংসার প্রতিপালনের অক্ষমতায় কি জীবনে বড় ধিক্কার বোধ হয়েছে ? তার উত্তরে সে বললে—তা হলে তো! আত্মহত্যা করতাম। এ এক আশ্চর্য ঔদাসীন্য। মনে হয়, হঠাৎ সে সংসার সম্বন্ধে এমন একটা জ্ঞানলাভ করেছে—যে জ্ঞানলাভের পর শোক, দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমানের আর কোন কারণ থাকবে না। তার যে অন্য রকম ধারণা

ছিল তার জন্য সে-ই দায়ী, সেটা তারই ভ্রম। কিন্তু সংসারের এই প্রত্যক্ষ মূর্তির অন্তরালে যে একটা অপ্রত্যক্ষ—সত্য সুন্দর প্রেমময়—কিছু বা কেউ আছে, এই মায়াপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে একটা নিত্যবস্তু কিছু আছে, সে বিশ্বাসও তার নেই; তাই সে মানুষের সমাজও যেমন ত্যাগ করেছে তেমনি সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়তেও তার প্রবৃত্তি নেই। কাজেই এ পাগলের মধ্যে আমি আসল নাস্তিককে দেখলাম। যারা তথাকথিত নাস্তিক, অথচ কামনা-বাসনা সবই আছে—নিজের মত করে জীবনযাপন করে তারা সত্যিকার নাস্তিক নয়, তাদেরও একটা জিনিস অর্থাৎ নিজের 'অহং'টার উপরে বিশ্বাস আছে। এ একেবারে নাস্তিক, তার কারণ এর মনোধর্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

যখনকার কথা বলছি তার পরে প্রায় চার দশক কেটে গেছে, কিন্তু ঐ অদ্ভুত পাগলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তার কারণ ঐ বিচিত্র চরিত্র মানুষটির সঙ্গে বন্ধু হেম বাগচির স্মৃতি আমার মনে অভিন্ন হয়ে জড়িয়ে আছে।

হেমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অতি সুমধুর। শুধু সুকবি বলে নয়, মানুষ হিসাবেও তার চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা সরল ঋজু পথ ধরে চলতে চাইত। তবুও আঁকাবাঁকা পথে চোট খাবার ভয়ে সে সদাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। বিশাল দেহে বিশাল দুটি চোখে ছিল একটা কোমল স্নিগ্ধতা। কথা বলত অনুচ্চ কণ্ঠে অতি ধীরে ধীরে—বাইরের কল-কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটা নিভৃত কুলায় আশ্রয় নিতে পারলেই যেন খুশি হত সে।

শুধু বৈঠকের দিনে নয়, আমার কাছে আসত সে যে কোন সময় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাবার জন্যে। একবার সে তার বাসায় নজরুলকে নিয়ে গিয়ে গানের আসর বসিয়েছিল, সে আসরে আমরা অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলাম। বেশ কেটেছিল সেদিনকার সন্ধ্যাটি।

সৌন্দর্য-পূজারীর দিনগুলি এমনি করে বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সূর্য-করোজ্জ্বল আকাশে কখন যে ঘন কালো মেঘ চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তা কেউ বলতে পারে না; হয়ত তার আভাসটুকু আসা মাত্র ক্ষণিকের মধ্যেই আলো অন্তর্হিত হয়ে যায়!

তিন চার বছর পরের কথা বলছি। হেমের যাতায়াত তখন বিরল হয়ে এসেছে। যেদিন আসত সেদিন একটা উদাস ভাব তার লক্ষ্য করতাম। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটাকে বেঞ্চির উপর এলিয়ে দিয়ে সে বলে উঠত—শঙ্কু, ভাল লাগছে না কিছুই। আমাকে সে আদর করে শঙ্কু বলে ডাকত।

আর কিছুদিন বাদে হেম যেন একেবারে অন্তর্ধান করল। বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলত হেম কলকাতার মাস্টারি ছেড়ে মফস্বলে মাস্টারি করছে ; কেউ বা বলত সে নিরুদ্দেশ। সঠিক খবর কেউ বলতে পারত না। তার অশান্তির কথা যেটুকু আমাকে সে বলেছিল তাতে কখনও মনে হয় নি সে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে। এই বিশ্বের পরিমণ্ডলে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ছন্দোবদ্ধ মূর্ছনা নিরন্তর ঝঙ্কৃত হচ্ছে এবং তাতে আমাদেরও হৃদয়-বীণার সুর মিলে যে একটা ঐকতান সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে আমাদের সম্বোধি কয়জনের আছে ? আমাদের বীণার একটি তার ছিন্ন হলে আমরা হয়ে যাই বিকল।

হেম কি আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, না, তার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ?

তীর্থ-পথের কবি একদিন মানুষকে সম্বোধন করে গেয়েছিল—

কুসুম ফুটেছে আজ, হেরি ঐ—
মধু কই হায়,—
পিপাসায় আকণ্ঠ শুকায় !
ব্যথায় দহিছে প্রাণ, কোথা শান্তি ?
শ্রান্তিরাশি আজ
পদে পদে করিছে বিরাজ !

কিন্তু তার পরেও তার আশ্বাস ছিল—

আলোক-তরণী আসে,—রাত্রি যায়,
ব্যথা সবে ভোল
শুনি তাই অশান্ত কল্লোল।

কবিবন্ধু হেমচন্দ্রের রাত্রির কি অবসান হয় নি ? তিমিরান্ধকার ভেদ করে উষার উদয়ে নবারুণ কি যায় নি আজও দেখা ?

একটা ব্যথা-বেদনাতুর স্মৃতি আজও জড়িয়ে আছে আমার মনে !

১১

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের জয়ন্তী হয়ে গেল। আমরা বললাম জয়জয়ন্তী। জয়ন্তীর আয়োজন হল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গজেন ঘোষের বৈঠকখানায়। গজেনবাবুর বৈঠকখানায় যে বৈঠক বসত তা একটু অভিজাত শ্রেণীর। কম্যুনিস্ট ভায়াদের ভাষায় যাকে বলা যায় 'বুর্জোয়া'। সেখানে জ্ঞানী-গুণী-ধনী এবং আমাদের

পূর্বসূরী বহু সাহিত্যিক ছাড়াও এমন কি প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদধূলিও পড়ত। প্রায়ই বিকালের দিকে জমজমাট বৈঠক বসত। বিরাট হলঘরটিতে বহু লোকের বসবার সংস্থান ছিল। সে তুলনায় আমাদের বৈঠক ছিল নিতান্ত 'প্রোলিটারিয়ট' একটা দোকানঘরে স্বচ্ছন্দ আড্ডা জমাবার অবসর আর কতটুকু? তবু ওরই মধ্যে আমাদের আনন্দের অবধি ছিল না।

প্রেমেন্দ্র-সম্বর্ধনা সভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র অবিস্মরণীয় কাব্যরসিক প্রখ্যাত অতুল গুপ্ত মহাশয়। কেউ কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। বললেন, কী প্রয়োজন ছিল এই সম্বর্ধনার? এত অল্পবয়সের কবি, আর পুঁজি তো ঐ মাত্র একখানা কবিতার বই 'প্রথমা', তার জন্যে আবার এত ঘটা! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

কিন্তু পুঁজি সামান্য বলেই কি কবি নগণ্য? 'কল্লোল' সম্প্রদায়ের এই কবির কাব্যে বাজল নতুন সুর—নতুন ইসারা, চোখের সামনে খুলে গেল যেন আনন্দরসসিক্ত নতুন কল্পলোক!

এ কোন্ কবি?—যে কবি গাইলেন—

> অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম
>
> চেন কি তাদের ভাই?
>
> দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
>
> ছুটেছে বল্গা নাই!
>
> পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে আকাশের সীমা নাই,
>
> ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির;
>
> প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে তাই,
>
> তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির!
>
> বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
>
> অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী;
>
> রক্তে আমার অমনি গতির নেশা;
>
> নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
>
> আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা!

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র পাখার আবেগ যেন মনকে টেনে নিয়ে যায় দূর হতে দূরে দূরান্তরে। সেই একই আবেগ ধ্বনিত হয়েছে প্রেমেন্দ্রের বীণায় নতুন

মূর্ছনায়। এখানে যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে কবি তাকে তাঁর নিজেরই গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, তাকে ছেড়ে দিয়েছেন অপার দিগন্তে যেখানে সহৃদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে উঠবে তার প্রতিধ্বনি। এটাই হল 'রস' আর এই রসই হল কাব্যের আত্মা।

অতুল গুপ্ত তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসায় বলেছেন—

কাব্যের রসবিচার মানুষকে কাব্য-রসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস। আলঙ্কারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে "সহৃদয়হৃদয়সংবাদী"। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য-রসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে 'রস'-এর আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস।

সুতরাং কাব্যের রস আস্বাদন করতে হলে কবির হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের সংযোগ হওয়া চাই। কাব্যের মধ্যে ধর্মের নির্দেশ কিংবা সামাজিক মঙ্গল যাঁরা আশা করেন তাঁরা অরসিকের পর্যায়ে পড়বেন।

সমাজ থাকলেই সমাজ-চেতনা থাকবে এবং সমাজ-চেতনা হতেই সামাজিক মানুষ সমাজের মঙ্গলসাধনের চিন্তা করে। কিন্তু কাব্যের মধ্যে যদি সে ইঙ্গিত থাকে তবে কাব্যের তা লক্ষ্য নয়, তা পরোক্ষ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর সমাজ-চেতনা হতেই লিখেছেন—

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়।
মাল বয়ে বয়ে খাল হলো যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

এখানে কবি যে ভাব ও অনুভাব সৃষ্টি করেছেন তা সামাজিক মানুষের দুঃখ বেদনায় সংবেদনশীল পাঠকের হৃদয়ে কি একটা বেদনার রস জাগিয়ে তুলবে না? কাব্যের কাব্যত্ব এইখানেই সার্থক।

এই মাটির পৃথিবীকে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। এর সুখ দুঃখ-ব্যথা-বেদনা-হিংসা-দ্বেষ-প্রেম-বিরহ সবকিছুকেই তিনি জীবনের সহচর বলে

স্বীকার করেছেন। বেদনাতুর মানুষের হৃদয়ে তিনি নিজেরই ছবি দেখে সহনশীলতা এনেছেন নিজের চরিত্রে আবার প্রেমোদ্বেল চিত্তে চয়ন করেছেন মাধুর্যের পুষ্পপুঞ্জ। এই আনন্দ-বেদনায় পৃথিবীকে তিনি ছাড়তে চান না। তবু ছেড়ে যেতে হয়—এটা তাঁর জানা। হয়ত কোথাও আছে অন্যলোক। সেখান থেকে যদি ফের ফিরে আসেন তিনি এই মাটির ঢেলা দিয়ে গড়া পৃথিবীতে তবে কি তাঁকে সাদর আহ্বান জানাবে কি তাঁর পুরাতন পৃথিবী?

ও জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
আজ ভালোবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা?
—পারিব চিনিতে?
... ...
জন্ম লবো হয়তো সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিংবা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধা নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে;
কিম্বা— কোথা কিছু নাহি জানি!
... ...
আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ডপল সুধাসিক্ত করি,
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে?

কবির মনে এই অনাগত ভবিষ্যকালের অজানা সম্ভাবনার মধ্যে যে বেদনা ও সংশয় জড়িয়ে আছে তা কি সংবেদনশীল মনেও ঐ একই ঢেউ তোলে না? কাব্যের বিচারে শুধু এইটুকুই লক্ষণীয়।

অতুল গুপ্ত এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষ কোথায় এবং রসলোকের উদ্ভাস কেমন করে হয় তা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করলেন।

পার্বতী-বল্লভ কুসুমায়ুধ মদনকে ভস্ম করে ফেললেন কিন্তু তার প্রভাব সারা বিশ্বে সঞ্চরমান। এই ভাবটিকে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন তাঁর কাব্যে—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অতুল গুপ্ত বলেছেন—

এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব।

যাই হোক, সভাপতি মহাশয় প্রেমেন্দ্রের কবিতার প্রশংসাই করলেন এবং সর্বশেষে বললেন এই কবির ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট।

প্রেমেন্দ্রের জয় জয়ন্তী হয়ে গেল। তিনি কবি-স্বীকৃতি পেলেন। অতঃপর আমাদের দল প্রেমেনকে নিয়ে উপস্থিত হল আমাদের প্রোলিটারিয়েট বৈঠকে। এবার আলোচনা শুরু হল কবিগুরুর প্রভাব নিয়ে।

আমরা তখন বাস করছি প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। আমাদের একদিকে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং' আর একদিকে তিমির-বিদারণ 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রবল প্রভাব তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাঙ্কুরদের ওপর। সে প্রভাব নবজাতকদের পুষ্টিসাধন করেছে, না, তাদের বুদ্ধিকে খর্ব করেছে সেইটিই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে পূর্বসূরীদের প্রভাব থাকবে না—এ হতে পারে না। পূর্বসূরীদের আলোর আভা নিয়েই জ্বলে উঠবে নতুন আলোক, এমনি করে নিরন্তর আলোক-মালার সজ্জায় সাহিত্যের ইমারত ঝলকিত। রবীন্দ্রনাথের ওপর উপনিষদের প্রভাব কি পড়ে নি? পড়েনি কি তাঁর ওপর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রভাব? নইলে কি আমরা পেতাম 'ভানুসিংহ'-কে? বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছি শরৎচন্দ্রকে।

মহাকবি শুধু তাঁর কাব্যে নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনে দিলেন তাঁর বলিষ্ঠ মনের নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা; অনিন্দ্য সৃষ্টির মাধুর্য গঙ্গোত্রীর উৎস হতে নেমে এল গঙ্গা; সে গঙ্গার প্রবেগে দিকে দিকে ছুটে চলল অসংখ্য নদীনালা। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা পেলাম আমাদের ভাষা, আমাদের আশা।

নবজাতকদের মনে নবীন আশার সঞ্চার হলেও ভরসা যেন পায় না কেউ। আশঙ্কা হয় তীব্র সূর্যের খর রৌদ্রে বোধ করি নবাঙ্কুর সব শুকিয়ে যাবে!

অচিন্ত্যকুমার ছিলেন নিরলস, নির্ভীক। দুর্বার গতিতে তখন তিনি চলেছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আদর্শে সমাজের নানা স্তরের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। সৃষ্টি করছেন তখন তিনি যাযাবর জীবনের উদগ্র কামনা-বাসনার কাহিনী। হাতে ফুটল তাঁর মনোহরণের প্রেমের কবিতা—অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। চারিদিকে নিন্দা ও ধিক্কার। সমাজের শুচিতারক্ষায় রুচিবাগীশদের করুণ আর্তনাদ! পিছু হটা নয়, সমুখের দিকে শুধু অবারণ চলা। অচিন্ত্যকুমারের কণ্ঠে শুনা গেল অকুণ্ঠ নির্ঘোষ—

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারাল,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর।
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগসূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরও দূর।

কোথা থেকে এল এই দুঃসাহস অচিন্ত্যকুমারের? শুধু অচিন্ত্য নয়, তৎধর্মী সকল কচি ও কাঁচাকেই তো বাঁধন ছেঁড়ার ডাক শুনিয়েছিলেন কবিগুরু—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

সব কাঁচার দলই তখন পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচাতে লাগলেন। সবারই মন্ত্র হল—চোখ ঢেকে কোন লাভ নেই, চোখ দুটি খুলে রাখ। শুধু অবারণ চল। পায়ে কাদা লাগে লাগুক, চাঁদের আলোও তো ফুটতে পারে সামনে।

কবি নজরুল, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসুও ফুটে উঠল এই বন্ধনহীন চলার নেশায়।

'বেদে' উপন্যাসের লেখক অচিন্ত্যকুমার বহু নিন্দিত হলেও কবিগুরু তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নিলেন। জহুরি জহর চিনেছিলেন। সেই যাযাবর বেদে অচিন্ত্যকুমারের উদাত্ত কণ্ঠে তাই আজ ঝরছে বেদান্তশাস্ত্রের অমৃত-নির্ঝর।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের অনুকৃতি নয়, তাঁদেরই অনুসৃত পথে নবীনরা খুঁজে পেলেন তাঁদের স্বকীয়তা। এই স্বকীয়তাই সবুজ সজীবতার ঢেউ তুলে

পল্লবিত, পুষ্পিত হয় উঠল। দেখা দিলেন শৈলজানন্দ-প্রেমেন-প্রবোধ-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-তারাশঙ্কর।

শুধু ঘরে প্রস্তুতি নয়, বাইরের দিকেও নজর পড়েছিল তখন নবীন দলের। Continental Literature অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্য নিয়ে মাতামাতি চলছিল পুরাদমে। ফরাসি দেশের মোপাসাঁ, রোঁমা রোলাঁ, আ-ক্রীসতত, রাশিয়ার টলস্টয়, তুরগেনিভ, গোর্কি, শেখভ ইত্যাদি, নরওয়ের মুট্ হামসুন, জন বয়ের, ওদিকে ডি. এইচ .লরেন্স এমনকি আমেরিকার ও' হেন্‌রী ও হুইটম্যানও হলেন আদর্শ লেখকদের অন্যতম। প্রায়ই এইসব বিদেশী লেখকের রচনা নিয়ে আলোচনা চলত। কোথায় নতুন পথের ইঙ্গিত, কোথায় বা মানব-মনের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে কোন লেখকের মনোহারিত্ব তারই ভাষ্য পাওয়া যেত অনেকের কাছে।

একদিন অচিন্ত্যকুমারের মুখে শুনেছিলাম—

অধঃপতিত দীনদরিদ্রের প্রতি দরদ ও বন্ধনহীন যাযাবর জীবনের প্রতি টান—এই দুই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তৎকালীন বিদেশী সাহিত্য লোকপ্রিয় ছিল। আমরা ঐ একই কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দেহ সম্পর্কে দৃষ্টিকে আবৃত রাখবার সংস্কারও শিথিল হয়ে গিয়েছিলেন। হুইটম্যান ছিলেন ঐ নির্মুক্তিবাদের পুরোহিত—আমাদের সকলের পূজনীয়।

কবি হুইটম্যানকে আমেরিকার মানবগোষ্ঠীর সত্যিকার প্রতিভূ বলা চলে। তাঁর মতো আমেরিকার কোন লেখকই অমন জোরাল ভাষায় নির্ভেজাল বস্তু পরিবেশণ করতে পারেন নি। ছুতোরের সন্তানকে জীবনের গোড়ার দিকে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ফলে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিকের অন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর বিরাট কাব্যগ্রন্থ Leaves of Grass (তৃণ-পল্লব)। এই গ্রন্থে প্রেম, মৃত্যু, দেশপ্রেম, গণতন্ত্র, দেহসৌন্দর্য এমনকি যৌন-সম্পর্ক নিয়েও হুইটম্যান তাঁর দুর্বার লেখনী চালিয়ে গেছেন। কেবল যে দেহ-দেউলের উপাসক তিনি ছিলেন তা নয়, ঐ দেউলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত যে আত্মা তারও উপাসক তিনি ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—I am a poet of the body and I am a poet of the soul.

ঘরে-বাইরে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে তরুণ লেখকদল বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি করলেন এক নবযুগ। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে আবার এল নব যৌবন। মানুষের

জীবনে ফাল্গুন একবার আসে কিন্তু উদ্ভিদজগতে দেখি ফাল্গুন বার বার ফিরে যায়, বার বার ফিরে আসে। আমাদের সমাজ-চেতনায়ও তেমনি ফাল্গুন বার বার ফিরে আসে। তাই ঐ সমাজ-চেতনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়িত সাহিত্যেও যৌবনের আবির্ভাব হয় বারবার। হয়ত এ যৌবনেও পড়বে জরার ছাপ, তাতে নিরাশ বা নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই, আমরা ভবিষ্য যৌবনের সম্ভাবনার দিকে চেয়ে থাকব। জয় নব নবীনের জয়।

১২

গায়ক-কবি শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছাত্রাবস্থায়। সাপ্তাহিক 'বিজলী' কাগজের সম্পাদক তিনি তখন। তাঁর কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বল্প-পরিসর স্থানের মধ্যে থাকত একটি ছোট্ট কবিতা বা গান—করালবদনী, নৃমুণ্ডমালিনীর কাছে পীড়িত মানবহৃদয়ের একটা সকরুণ প্রার্থনা। পরাধীনতার জ্বালা যে তখনও জ্বলছে ধুকে ধুকে। ঐ রকম গুটিকয়েক কবিতা বা গান লিখে ফেলেছিলাম তাঁর কাগজে; সে যেন দনুজদলনীর উদ্বোধনী মন্ত্র!

তারপর ১৯২৩ সালে যখন এলাম জীবন সংগ্রামে এই কলকাতা শহরে, তখন এই শ্রদ্ধেয় বন্ধু নলিনীকান্তকে পেলাম চরম আড্ডাবাজ রূপে। বহু আড্ডাখানায় তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অনেক সুধী-গুণীজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এমনি আড্ডাখানা ছিল বৌবাজারের চেরি প্রেসে 'বৈকালী'-সম্পাদক শচীন সেনগুপ্তের ঘরে একটা; আর একটা আড্ডা বসত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে।

সুধীজনের আড্ডাখানাতেই যে অনেক বৃহৎ সম্ভাবনা গজিয়ে উঠে শিক্ষা-সংস্কৃতির ফুল ফোটায় তা বোধ হয় অনেকেরই জানা। জীবন-সংগ্রাম তো আছেই কিন্তু সে সংগ্রামকে রস-মধুর করার উৎস বোধ হয় এই ধরনের আড্ডাখানাতেই খুঁজে পাওয়া যায়।

চেরি প্রেসের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলে পাশাপাশি দুখানা ঘর পাওয়া যেত। একদিকে বসতেন শচীন সেনগুপ্ত, অপর ঘরে বসতেন উপেন বাঁড়ুয্যে। একটা বৈকালীর কার্যালয় অপরটি আত্মশক্তির।

চুম্বক যেমন করে লোহাকে টানে আমাকে তেমনি টানত ঐ চেরি প্রেস। আকর্ষণটা ছিল শুধু শচীন সেনগুপ্তের নয়, আরও অনেকের। এখানে আসতেন

বাঘা বাঘা সব বিপ্লবী যাঁরা জীবন পণ করেছিলেন স্বদেশের মুক্তির জন্তে। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের জৌলুস ছিল তাঁদের গায়ে। আসতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, কাজি নজরুল ইসলাম এবং আরও খ্যাত ও প্রখ্যাত কত যে ব্যক্তি—কার নাম করব? সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, কলাবিদ, কবি প্রভৃতি মিলে চেরি প্রেসকে করে তুলেছিল এক চরম আকর্ষণের স্থান। শত দিকের শত ধারা এসে মিশে এই স্থানটিকে তখন করে তুলেছিল এক মহা সঙ্গমতীর্থ!

আমার বেশির ভাগ সময় কাটত শচীন সেনগুপ্তের ঘরেই। কারণ, আত্মশক্তি-সম্পাদকের ঘরে সমাগম হত অভিজাত শ্রেণীর; সেখানে সম্পাদক ছাড়া অপর ব্যক্তিরা ছিলেন ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুতরাং সঙ্কোচে সেখান থেকে সরে এসে এইখানে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। স্বল্প পরিসরের মাঝে স্বল্প কয়েকজনের সহজ হওয়া সহজ ছিল। আড্ডা দুই ঘরেই চলত সমান তবে আমাদের ছিল যেন এটা প্রোলিটারিয়েটের আড্ডা।

তবু তাল কেটে যেত মাঝে মাঝে। হয়ত কোন বিষয়ের আলোচনা চলেছে অব্যাহত অথবা কোন হাস্যরসের কাহিনী জমে উঠেছে বেশ, এমন সময় এলেন শচীনদার কোন সহকর্মী—আসতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে অনেক: অপরাধীর মত প্রবেশ করে তিনি বিনীত অছিলার ফাঁক দিয়ে সম্পাদক মশায়ের করুণা ভিক্ষায় প্রয়াসী হচ্ছিলেন এমন সময় ঘটে গেল এক কাণ্ড, দপ করে জলে উঠলেন শচীন দা অকস্মাৎ!

আগন্তুক টেবিলের উপর থেকে একখানা বই সরিয়ে অতি নিম্নস্বরে কী যেন বলবার চেষ্টা করছিলেন। আর যায় কোথায়?

বইখানা ওপাশে সরিয়ে রাখার অর্থ?—ক্রুদ্ধ সম্পাদক হেঁকে প্রশ্ন করলেন।

মানে—

মানে, না তোমার মাথা।

সম্পাদকের টানা দুটি ডাগর চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ভিতরে তাঁর উত্তাপ আগেই জমা হচ্ছিল, এইবার তার বহিঃপ্রকাশ!

এমন চেহারা তাঁর আগে আর কখনও দেখি নি। রোষকষায়িত লোচন। প্রথম বিস্মিত হলাম। বিস্মিত কেন, রীতিমত ভীত! সংলাপে সম্পাদকের স্মিত হাসি দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এ কী? শচীনদার এরূপ আকস্মিক উষ্মায় একটু যে বিরক্তও না হয়েছি তা নয়।

পাঞ্জাবির উপর একখানা উড়ানি উড়িয়ে দিয়ে চলতে ভালবাসতেন তিনি।

তাঁর চলনটা ছিল দোদুল্যমান। ঘরে আগমন কিংবা ঘর থেকে নির্গমনের সময় সেই ভাবটা প্রকাশ পেত একটু বেশি মাত্রায়। মাথার বাঁপালো চুলগুলো (বাবরি নয়) ঘাড়ের কিনারে এসে সৌন্দর্যই বাড়াত, দৃষ্টিকটু হয় নি কোনদিন। সবটা মিলিয়ে তাঁর ছিল একটা কবি-কবি ভাব। এই ভাবের বৈপরীত্যে কঠোর কাঠিন্য দেখে তাই ভীত হয়েছিলাম।

তবে সেই সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাও আমার হল যে, শচীন সেনগুপ্ত কোমল, মধুর ও আড্ডাবাজ হলেও কর্তব্যে ছিলেন কঠোর, দায়িত্বহীনের প্রতি নির্মম।

'রূপান্তর' কথাটা যোগী ঋষিদের কাছে গভীর অর্থব্যঞ্জক। তাঁদের রূপান্তর ঊর্ধ্বমুখী। দেহ-প্রাণ-মনের রূপান্তর তাঁদের কাছে আত্মোপলব্ধির পথ—যে উপলব্ধিতে ধরা পড়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির একাত্মতা সৃষ্টির মূলে একজন আছে এটা যখন জানতে পারি তখন সেটা হল পরোক্ষ জ্ঞান; আর এটা যখন জানি 'আমিই সেই' তখন তাকে বলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষ জ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥

সে গভীর তত্ত্বের কথা থাক। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনেও তো রূপান্তর ঘটে। সে রূপান্তরের রকমফের আছে তবু তারও পিছনে প্রয়োজন সাধনা। এ সাধনায় সচেতনতা হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত না হলেও আসে কোন বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে, অকস্মাৎ। শচীন সেনগুপ্তের জীবনে এই রূপান্তর ঘটেছিল এমনই এক নির্মম আঘাতে। সেই কথাই বলছি।

সাহিত্যিক শচীন সেনগুপ্তের পরিচয় পেয়েছিলাম 'নারায়ণ' পত্রে তাঁর ধারাবাহিক 'চিঠির গুচ্ছ' পড়ে। বেশ মিষ্টি লাগত। যে বয়সে বেশ মিষ্টি লাগারও একটা স্বতন্ত্র অর্থ থাকে, আমি সেই বয়সেরই বিশেষণ ব্যবহার করেছি। এই বিশেষণের বিশেষ অর্থটি ভাবুকধর্মী মনের কাছে গ্রাহ্য, একে বিশ্লেষণ করে সর্বজনগ্রাহ্য করার দুশ্চেষ্টা আমার নেই।

মানুষের হৃদয়বৃত্তির নানা রসের ধারা এসে মিশে একটা প্রবহমান কাহিনীর স্রোতস্বতী সৃষ্টি করে চলেছিল এই চিঠিগুলি। ফল্গুর মত যে ধারা থাকত অগোচরে অথবা যার প্রকাশের পথ হয়েছিল রুদ্ধ তা যেন পেয়েছিল এক নতুন পথ। চিঠির মাঝে আছে যেন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা স্বচ্ছন্দ গতি। নিজের এবং আমারই আশেপাশের আর পাঁচজনের ছবি ভেসে আসত মনে। নিছক কল্পনা, এ কথা মনেই হত না তখন। বেশ লাগত।

কল্পনা-বিলাসী শচীন সেনগুপ্তকে প্রথম দেখলাম কঠিন বাস্তবক্ষেত্রে! সাহিত্যিক শচীন সেনগুপ্ত সাংবাদিক রূপে দেখা দিয়েছেন তখন। এই সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয়ের কথা আগেই বলেছি। তখন তিনি 'বৈকালী' দৈনিক কাগজের সম্পাদক। তার আগে তিনি 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদকতা করেছিলেন কিছুকাল।

গায়ে একটুখানি লেখকের গন্ধ ছিল, তাই আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে গেল সহজেই ; আলাপ ক্রমে সংলাপে পরিণত হল এবং তারপর দিনের পর দিন তা ঘনীভূত হয়ে হৃদয়ের ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলল একটি মাধুর্যের শতদল।

আসল কথাসাহিত্যিক যা নিয়ে কারবার করেন, শচীন সেনগুপ্তের কারবার ছিল তার থেকে ভিন্ন। তাঁর 'চিঠির গুচ্ছ'র নরনারীর পরিচয় পাওয়া গেছে হৃদয়ের প্রবহমানতায় নয়, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে। তাদের কাহিনী বয়ে গেছে উত্তরবাহিনী হয়ে, দক্ষিণবাহিনী নয়। কথার চেয়ে তাদের কথায় প্যাঁচ ছিল বেশি। তাই গল্পের চেয়ে তাঁর লেখায় ছিল তখন প্রবন্ধের রস এবং সে লেখায়ও পেতাম বীরবলী ধাঁচের কথঞ্চিৎ প্রভাব।

আমার কিন্তু সুবিধা হয়েছিল বেশ। শচীনদার ধাত বুঝে চলার শিক্ষা আমার হয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে দেখেছি তাঁর উগ্র মেজাজের ধমকানিতে লাঞ্ছিত ও বিব্রত হতে অনেককে, কিন্তু আমার এমনই সৌভাগ্য যে, আমাকে তাঁর রক্তচক্ষুর পীড়া ভোগ করতে হয় নি কখনও। বেগতিক দেখলেই আমি দন্ত বিকশিত করে এমনই একটা শান্ত, সুবোধ বালকের ভাব দেখাতাম যাতে করে প্রতিপক্ষকে একটা যুতসই আঘাত করবার প্রবৃত্তি তাঁর নিমেষে উবে যেত। এমনই করে আমাদের সম্পর্ক হয়েছিল নিবিড়, অচ্ছেদ্য।

'বিজলী' ও 'বৈকালী' সংবাদপত্রে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ পেত মৌলিক চিন্তা, সত্যভাষণে নির্ভীকতা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিজলীতে তাঁর অনেক মন্তব্য তর্কের বিষয়ীভূত হলেও তাতে সমর্থন ছিল আসল হেডকোয়ার্টার্সের অর্থাৎ পণ্ডিচেরির ঋষির।

রাশি রাশি কাগজ ও মোটা মোটা বই নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেছি সম্পাদক মশায়কে অনেক দিন। আমার কাছে তা ছিল মোহের দৃশ্য। ভাবতাম এ জীবন তো বেশ। কত দেশের কত বিচিত্র সংবাদ নিয়ে কারবার সম্পাদকের কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর বহুজনচিত্তে প্রবেশ করবার কী অবাধ সুযোগ। মনে মনে কামনা করতাম এই জীবন।

আমাদের পরিচয়ের বছর চারেক পরে ভাগ্যক্রমে আমাদের কর্মক্ষেত্র হয়ে গেল এক। 'ফরওয়ার্ড' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে তিনি হয়ে এলেন 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক আর আমরা একদল তরুণ ভর্তি হলাম বাংলায় দৈনিক 'বাংলার কথা'র ক্ষুদে সম্পাদক হলে। বলা বাহুল্য শচীন সেনগুপ্ত ও আমার নিয়োগের মূলে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 'উপেনদা'।

তরুণদের দ্বারা খবরের কাগজ চালাবার দুঃসাহসিকতা ছিল সুভাষচন্দ্রের, কেন না তাঁর চোখে তখন 'তরুণের স্বপ্ন'। শচীনদা ছিলেন এই তরুণদের পাণ্ডা, মিলিটারি শাস্ত্রে যাকে বলে কম্যাণ্ডার আর এই কাগজে সৈনিকদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন উপেন বাঁড়ুয্যে – যাকে বলে 'জি. ও. সি'। এর আগে সাংবাদিক শচীন সেনগুপ্তের নৌকা চলেছিল ভেসে এখানে ওখানে। এইবার তাঁর নৌকার পালে লাগল অনুকূল হাওয়া অর্থাৎ সাংবাদিক এইবার হলেন চিন্তামুক্ত, স্বচ্ছন্দগতি। একটানা কয়েক বছরের সম্পাদনায় তাঁর মধ্যে যে বিকাশ দেখেছি তা শুধু অনুকরণীয় নয়, শ্লাঘ্যও বটে। স্বাধীনচেতা হওয়ার পরিণাম আসে অনেক সময় দুর্ভোগ রূপে। একে অকুতোভয়ে গ্রহণ করবার শক্তিও তাঁর যে ছিল অদম্য, তা পরে প্রকাশ পেয়েছে।

ফরওয়ার্ড অফিসে তাঁর সঙ্গে আমরা যে কয়েক বছর কাটিয়েছি তার স্মৃতি এমনই মধুর হয়ে মনে জড়িয়ে আছে যে, তা কখনও বিলুপ্ত হবার নয়।

কাজের চেয়ে অকাজও আমাদের কিছুমাত্র কম ছিল না, আর সেই অকাজের মধ্য দিয়েই আসত কাজের অনুপ্রেরণা। শচীনদার ঘরটা ছিল তেতলায় আর আমাদের দোতলায়; মাঝে মাঝে তিনি আসতেন নেমে এবং আমাদের কেউ কেউ উঠে যেত উপরে। এই আরোহণ-অবতরণেরও স্থিতি ছিল এক সময়— সেটা বিকালের দিকে বৈকালিক আড্ডায়। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ এসে পড়লে সেই আগন্তুকের মনে নিশ্চিত বিস্ময় জাগত যে এই আড্ডাধারীরা কাজ করে কখন। অথচ কাজ হয়ে যেত ঠিকই এবং কাগজও বার হত যথাসময়ে।

সতীর্থ হিসাবে শচীনদাকে যা দেখেছি তাতে বলতে পারি তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত; অন্ধকারে বদ্ধকরা খাঁচায় তাঁর নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত, মুক্তপক্ষ পাখির ন্যায় তিনি উড়ে যেতে চাইতেন উদার আকাশের তলায় অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী। উত্তরকালে প্রগতির সঙ্গে যে কদর্থ এসে মিশেছে তাঁর প্রগতিতে তার ঠাঁই ছিল না; সেটা ছিল কল্যাণধর্মী। তরুণের ধর্ম ছিল

স্মৃতির পথ ধরে চলা, তাঁর ধর্মও ছিল তাই। আমাদের অগ্রজ হলেও আমরা তাঁকে তরুণ বলেই মানতাম।

'কল্লোল' চক্রের সাহিত্যিকরা সে যুগে ছিলেন তরুণ বলে অবজ্ঞাত ও অপাংক্তেয়। তাঁদের নিজেদের মুখপত্র 'কল্লোল' ছাড়া অন্যত্র তাঁদের কলকল্লোল শোনা যেত না, সর্বত্র ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। শচীনদা তাঁর আত্মশক্তির পৃষ্ঠা মুক্ত করে ধরেছিলেন তাঁদের কাছে। তারপর ধীরে ধীরে আস্তে উঠে তাঁরা যে আজ অভিজাত হয়ে উঠেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন কষ্টিপাথর—তাতে সোনা যাচাই যেত।

'আত্মশক্তি' শচীনদার হাতে ধীরে ধীরে হয়ে উঠল স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্র। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মনীতি—কোন বিষয়েই কোন বাধা ছিল না স্বাধীন মতামত প্রকাশে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকে যে সব ত্রুটি পুঞ্জীভূত হয়ে যে সম্ভাব্য সমাজকে ডেকে আনছিল তার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন শচীনদা, তাই তাঁর কাগজে একাঙ্ক নাটিকা 'যখন তারা কথা বলবে' ছাপতে তাঁর দ্বিধা হয় নি একটুও। বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটিকার প্রবর্তনের পরীক্ষা চলেছিল তাঁর কাগজে কিছুকাল ধরে। নাটক রচনার দিকে শচীনদার তখন প্রবল ঝোঁক এসেছে। তাঁর 'রক্তকমল' নাটিকাটি এই সময়কার রচনা। এই নাটিকার গানগুলি রচনা করেছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সরযূবালা। রঙ্গালয়ে নতুন দিনের সঙ্কেত করে গেল এই নাটিকাখানি। আজও কানে বাজে কোকিলকণ্ঠী ইন্দুবালার সুললিত গান—

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলতে গায় গীতি॥

অথবা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম॥

লেখা প্রকাশের বেলায়ও স্বাধীনচেতা সম্পাদকের দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

খাতিরে পড়ে তাঁর মতে অচল লেখাকে তিনি চালু করতে রাজি হন নি কখনও— এমনকি ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোসের সার্টিফিকেটেও নয়। আবার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অখ্যাত লেখকের লেখাও তাঁকে ছাপতে দেখেছি বিনা দ্বিধায়। সম্পাদক স্বাধীন হলেও তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন নন, এর প্রত্যয় তাঁর হয় নি কখনও ফরওয়ার্ড অফিসে থাকাকালে। ফরওয়ার্ড কোম্পানি ছিল বিশেষ করে একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠান। দলগত কারণে এমন অনেক কিছু চাপা দিয়ে রাখতে হয় যা বাইরে এলে বাইরের আবহাওয়াকে দূষিত করে। পক্ষোদ্ধার করতে গিয়ে একবার বিপদে পড়ে গেলেন শচীনদা। শচীনদা তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে এমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন যা সত্যের আলোকে দেখা অথচ যা প্রকাশ করলে যাঁরা সেই সব বিষয় নিয়ে কারবার করেন তাঁদের গায়ে গিয়ে তীরের মত বিদ্ধ হয়। হলও তাই। স্বরাজী দলের পাণ্ডা সুভাষচন্দ্র তীরাহত হয়ে সম্পাদকের সঙ্গে রীতিমত ঠোকাঠুকি শুরু করে দিলেন। একদিন এল সুভাষচন্দ্রের এক সুদীর্ঘ চিঠি; তাতে তিনি বহু বিষয়ে সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। সম্পাদক সে চিঠির জবাব দিলেন যথাযথ কিন্তু মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢেকে রাখতে রাজি হলেন না কিছুতেই, অথচ রাজনীতি ক্ষেত্রে অপভাষণ যে একটা বড় রকমের আর্ট তাতে পারদর্শিতা দেখাবার প্রবৃত্তি তাঁর জাগল না আদৌ।

এ-হেন সম্পাদককে নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অগ্রজ বিপদে পড়ে গেলেন। তাঁর চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা বৃথা ভেবে তাঁরা প্রমাদ গণলেন।

শরৎ বোসকে অনেকে গান্ধী মনে করতেন, কিন্তু শচীন সেনগুপ্তের দম্ভও কম ছিল না। দুই দম্ভের সংঘর্ষে একদিন আনবিক বোমার আওয়াজ পাওয়া গেল অকস্মাৎ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোসের চিঠি এল শচীন সেনগুপ্তের কাছে—'কাল থেকে আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই।'

প্রয়োজন নেই? নেই। শচীন সেনগুপ্ত তাতে পরোয়া করেন না।

সেটা ১৯৩০ সাল। ঠিক পুজোর মুখেই এই বোমা বিস্ফোরণ। বোধনের বাজনা না বাজতেই বিসর্জনের পালা। মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে এই সময়ে এরকম আকস্মিক বজ্রাঘাত যে কী নিদারুণ তা সহজেই অনুমেয়। একটা বড় রকমের আঘাত পেলাম। বিচ্ছেদ-কাতর মন এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রইল।

হাতিবাগান বাজারের ঠিক গায়েই থাকতেন শচীনদা। এক ফালি বারান্দা

যুক্ত তাঁর দোতলায় ঘরখানি ছিল ঠিক গ্রে ষ্ট্রীটের উপরেই। ঐখানেই হল এখন তাঁর স্থায়ী আশ্রয় পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে। 'রক্তকমল'-রচয়িতার চক্ষে আবার নতুন স্বপ্ন। তাঁর জীবন-দেবতা তাঁকে কিসের সঙ্কেত দিলেন?

দিনের পর দিন যায়। শচীনদা ধ্যানীর ন্যায় নিজের মধ্যে ডুব দিলেন। সে যে কি কৃচ্ছ্রসাধনা তা যাঁরা তাঁকে তখন দেখেন নি, তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না। ধূলি-সমাকীর্ণ কাগজ ও বইয়ের স্তূপ জমা হয়েছে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ। চারিদিকের দেওয়ালে উইপোকার অজস্র সমারোহ। ধূলি-ধূসর মলিন টেবিলটার উপরে একটা থালায় আহার্য বস্তুর কতকাংশ হয়ত চোখে পড়ে; গেলাসের অর্ধেকটা জল ঘোলাটে, হরিদ্রবর্ণ, মনে হয় গত রাত্রির প্রক্ষালন ক্রিয়া তাইতেই সারা হয়েছে। এমন দুর্দিনেও তাঁর বিশৃঙ্খল, অপরিচ্ছন্ন ঘরে জনসমাগমের কমতি ছিল না। কিসের আকর্ষণ ছিল তাঁদের? এই অপরিচ্ছন্ন ঘরেও ছিল একটা পরিচ্ছন্ন মন—মোহ ছিল তারই। এমন দিন তো গেছে যখন ক্রমান্বয়ে সাত আট মাসের শুধু ঘর ভাড়া নয়, আহার্য বস্তুরও মূল্য দেবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তবু বাড়িওয়ালা বা হোটেলওয়ালা তাঁকে নোটিশ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁরা জানতেন শচীন্দ্রনাথ তাঁদের মারবেন না, সুদিন এলে তিনি তাঁদের পাওনার পাই-পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেবেন; আর যদি শচীন্দ্রনাথের সুদিন না-ই আসে তাতেও বোধ করি তাঁরা দুঃখ বোধ করতেন না।

এই সময় শচীনদা একদিন আমার আস্তানায় ধূমকেতুর মত উদয় হলেন। আশ্চর্য বোধ করলেও মনটা আনন্দে নেচে উঠল। অনেকদিন বাদে তাঁকে দেখলাম, কারণ আমার এখানে আগমন তাঁর ইদানীং বিরল হয়ে গিয়েছিল। শচীনদাকে দেখলাম বেশ খুশি-খুশি ভাব—চোখে-মুখে হাসি জড়ান। বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

কবি, চল যাই চা খেয়ে আসি—বললেন তিনি।

আমাকে তিনি কবি বলে ডাকতেন। বললাম—চা? এত বেলায়?

হ্যাগো, হ্যা। উঠে পড়। চায়ের আবার সময় অসময় আছে নাকি?

বুঝলাম শচীনদার সময়টা বোধহয় এখন ভালই যাচ্ছে।

অদূরেই বেলখোদের পাশে ভাঙা-মন্দিরশোভিত স্বল্প-পরিসর বিখ্যাত জ্ঞানবাবুর দোকান। মাত্র চার পয়সা দিলে পুরু মাখন-মাখান একখানা টোস্ট আর তার সঙ্গে এক কাপ চা পাওয়া যেত। এর সঙ্গে যদি চার পয়সার ওমলেট

ও এক পিস্ পুডিং জোটে তবে তো তা হল চা-পানের বিলাস! অনেক দিন পয়সা আমিই দিতাম, কারণ শচীনদার তখনকার অবস্থা আমি জানতাম।

এদিনে চট্ করে শচীনদা পকেট থেকে পয়সা বার করে দোকানির পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে বললেন—চল যাই।

পয়সা থাকলেও যা, না থাকলেও তা-ই। একই নিঃসঙ্কোচ অবস্থা। এমনই করে ধ্যানীর সাধনায় একদিন সিদ্ধিলাভ হল। রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল তাঁর 'গৈরিক পতাকা'। এই নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তেরও পতাকা উড্ডীন হল। বাংলার নাট্যসাহিত্যে আবার যেন এল নব চেতনা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এই নাটকের অভিনয়ে যে জনসমাগম হতে লাগল—তাতে মনে হল পরাধীন দেশের লাঞ্ছিত, সংক্ষুব্ধ আত্মা ছত্রপতি শিবাজির মধ্যে পেয়েছে তার মুক্তির সঙ্কেত।

এই সময় একদিন সকালবেলায় শচীনদা এসে আমার গরিবখানায় হাজির। মুখে বোধ হয় একটা বর্মা চুরুটও ছিল। বেলা তখন নয়টা বাজে। কী রকম? বেশ একটা আমিরি ভাব যেন!

পকেট থেকে একখানা মোটা টাকার চেক বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—কবি, এইখানা ভাঙিয়ে দিয়ো তো।

ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা জমা পড়ে নি তখনও। হয়ত পরের দিন এই টাকাটার সবটাই যাবে তাঁর হোটেল মালিকের হাতে। আজকের আমির কাল আবার ফকির।

তখনকার দিনে এই টাকার অঙ্ক ছিল অনেক ভারি। একসঙ্গে এতগুলো টাকা পাওয়া কল্পনাতীত ছিল।

সকালে তো চা খেয়েছি, আবার? একবিন্দুও আপত্তি ওঠে নি মনে।

চায়ের নেশা নয়। চায়ের পেয়ালা আমরা আশ্রয় করেছি অনেক সময় পারস্পরিক আনন্দ-বেদনার বিনিময়ের অবলম্বন হিসাবে। সে-দিনের চা-পান হয়েছিল অমৃতপান।

সাংবাদিক শচীন সেনগুপ্ত নাট্যকার রূপে বিকশিত হলেন। বুঝি-বা পেলেন তিনি তাঁর সত্যকার স্বরূপ। যে কথাসাহিত্যিক একদিন ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণিকের চমক দিয়েছিলেন, সাংবাদিক রূপে যিনি নিয়ে এলেন আষাঢ়ের আকাশে ঘন মেঘের ঘটা, নাট্যকারে রূপান্তরিত হয়ে তিনি শুরু করলেন শ্রাবণের বর্ষণ। আমি তাঁর বিকাশের মধ্যে এই তিনের ঘনীভূত সত্তা দেখতে পাই।

গৈরিক পতাকার পর 'ঝড়ের রাত' এনে দিল বাংলার রঙ্গমঞ্চে ঝড়। পরিচালনা করেছিলেন নাট্যনিকেতনের তৎকালীন পরিচালক সতু সেন। ঘন ঘোর কালো মেঘের বুক চিরে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক, ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষরাজির দৃশ্যটি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলছিল, আর সেই সঙ্গে কানে আসছিল গুরুগম্ভীর মেঘ-গর্জন। নাটকীয় ঘটনায় বাত্যাহত জীবনের সকরুণ কাহিনীতে বেজেছিল পীড়িত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি। শুধু অভিনয়ের পক্ষে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের অভাব তখন নাট্যকারকে পীড়া দিচ্ছিল কিন্তু তা তখন সম্ভব হয় নি। শচীনদার আমন্ত্রণে তাঁর 'স্বামী-স্ত্রী', 'জননী'-ও দেখেছি। 'জননী' অভিনয়ের সময় 'ওয়াগন স্টেজ' তৈরি হয়েছিল—তাকে ঠেলতে হয়েছিল। এ-যেন হল সেই পরিকল্পনার সম্ভাব্য পরিণতির দিকে দ্রুত ঠেলে দেওয়া—প্রগতির দিকে দ্রুত পদক্ষেপের ইঙ্গিত। দেখলাম নাট্যকার দৃষ্টিপাত করেছেন সামাজিক মানুষের মনের গহনে। মনস্তাত্বিক খুলে ধরলেন আমাদের সামনে আমাদের নিগূঢ় সত্তার অনন্ত গুহার দ্বারগুলি, কত বিচিত্র রঙের কত বিচিত্র খেলা সেখানে। দেখালেন তিনি হৃদয়ের তরঙ্গমালা—উত্তাল, ভীষণ; কভু বা উদ্বেল, উত্তাল আবার কখন স্থির, প্রশান্ত।

তারপর বহুদিন কেটেছে। চারদিকে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের খ্যাতি পড়েছে ছড়িয়ে।

উত্তরকালে যখন 'সিরাউদ্দৌলা' অভিনীত হচ্ছে তখন একদিন আমন্ত্রিত দর্শকরূপে এলেন সুভাষচন্দ্র—সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্ক অপসারণকারী সুভাষচন্দ্র।

অভিনয় শুরু হবার পর অনেকটা এগিয়েছে এমন সময় যেন কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। দর্শকের মধ্যে কয়েকজনের চোখে একটা চাপা বিস্ময় সঞ্চারিত হল এদিকে ওদিকে। নাট্যশালায় উপস্থিত নাট্যকারের কাছে খবর এল সুভাষচন্দ্রের চোখে জল, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন! হয়ত অনেকের চোখেই জল ঝরেছিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চোখে জল! সেইটাই যে বড় সংবাদ।

তারপর একটা পট পরিবর্তনের সময় খবর এল সুভাষবাবু ডাকছেন শচীন্দ্রনাথকে, তিনি কাছে পেতে চান নাট্যকারকে। কিন্তু সুভাষবাবু যে কাঁদছেন। নাট্যকারের সঙ্কোচ হল। কি জানি কাছে গেলে যদি আবার তাঁর চোখে ধারা বয়! কিংবা হয়ত আরও কোন স্মৃতি নাট্যকারের সঙ্কোচকে দ্বিগুণতর করেছিল। তিনি ব্যস্ততার অছিলায় নিজেকে রাখলেন লুকিয়ে।

অভিনয় শেষ হল। সুভাষচন্দ্র তাঁর মোটরের হুডের একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথের অপেক্ষায়। সংকোচ এবার কাটাতেই হল নাট্যকারকে।

সুভাষচন্দ্র নাট্যকারকে আলিঙ্গন করে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—যেদিকেই হোক, চলুন আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসবেন।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে গেলে আজ বিপদ আছে দেখছি।

—কেন?

নাট্যকারের দৃষ্টি পড়েছিল সুভাষের চোখের দিকে। সেখানে জলের দাগ তখন ভাল করে মেলায় নি।

বললেন নাট্যকার—কী কথা বলব আপনার সঙ্গে আজ? হয়ত এখুনি আবার কেঁদে উঠবেন। আমাদের পক্ষে সহজ হওয়া আজ আর সম্ভব নয়। যাব আর একদিন।

সুভাসচন্দ্র তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে হাসির দীপ্তি ছিল না।

শচীন্দ্রনাথ গেলেন না। সুভাষচন্দ্র বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। তাঁর হৃদয়ের কোণে সঞ্চিত কোন বেদনার ভার তিনি কি আজ নামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?

শচীন্দ্রনাথ 'আর একদিন'-এর কথা বলেছিলেন। কিন্তু আর একদিন'ও আর আসে নি। ঐখানেই যবনিকা।

সুভাষের চোখে সেই যে জল—সে লাঞ্ছিত, প্রবঞ্চিত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের চোখের জল, না বিচ্ছেদক্লিষ্ট দুইটি হৃদয়ের দূরাগত কোন স্মৃতিস্থিত বেদনার বিগলিত ধারা?

১৩

১৯২০-২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় সারা বাংলাদেশ তখন টলমল করছে। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল বহরমপুরে এসে এক বিরাট জনসভায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন—Education may wait but swraj cannot. ঐ সভাতেই তিনি গান্ধীজিকে Torch Bearer আখ্যা দিয়ে এমন এক চিত্র আঁকলেন যে, সকলেই যেন আনন্দে নেচে উঠল। সবারই মনে এই বিশ্বাস যে,

স্বরাজ এল বলে, মেরে-কেটে বছর খানেক একটু কষ্ট করে লালমুখো গোরাদের বুটের ঠক্কর আর লাল-পাগড়ি সেপাইদের রুলের গুঁতো খেয়ে শ্রীঘরে গিয়ে লপসিকপ পরমান্ন উদরস্থ করে ফিরে আসতে পারলেই দেখব বাজিমাৎ। দেখব নতুন ঊষার নতুন সূর্য উঠেছে আকাশে।

আইন-আদালতের কারবার বন্ধ হল। উকিল-মোক্তারদের চোগা-চাপকান গাউন পোকায় কাটতে লাগল, ইস্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, এডুকেশন থাক কিছুকাল সুদিনের অপেক্ষায়। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এ ভি সাহেব। অদ্ভুত লোক, বেশভূষায় কোনই পারিপাট্য ছিল না, একটা প্যান্টের সঙ্গে সাদা একটা টুইল সার্ট গায়ে সারা বহরমপুর শহরে সাইকেলে টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন, এমন কি মফস্বলেও তিনি টহল দিতেন ঐ বেশে। চাষা-ভুষো, ভদ্র-অভদ্র সব লোকের সঙ্গেই তিনি মিশতেন, আলাপ করতেন অবাধে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, বাবে বাপরে, সে তো পয়লা নম্বরের জুজু। সেই দেব দুর্লভ ব্যক্তিকে পথে-ঘাটে কে দেখতে পায়? বড়জোর তাঁর দেখা মেলে কোন জাঁকালো সভা-সমিতিতে বা অন্য কোন উৎসবে অগণিত পুলিশ পাহারায়।

কিন্তু একী! এ ভি সাহেবের এ কোন রূপ? ভয়-ডর বলে কিছু নেই? ঘুরে বেড়ান যত্র-তত্র, হাসিমুখে কথা বলেন সকলের সঙ্গে। এমন জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট দেখা যায় না। অনেকেই বিস্মিত হয়ে বলত সাহেবদের মধ্যেও এমন লোক জন্মায়!

আবার একদল বলত—এ জান না বুঝি, সাহেব ঘুঘু নম্বর ওয়ান, অমন ভাল মানুষটি সেজে থাকলে হয় কি, সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে বেড়ান, ইংরেজদের শাসন-শোষণ নীতি চালাবার বড় একটা পাণ্ডা এই সাহেব। কেউ কেউ বলত, সাহেব জাতে আইরিশ কিনা। পরাধীনতার জ্বালা তাঁদের সইতে হয়েছে, তাই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

অনেকের মুখে পাগলা সাহেব বলতেও শুনেছি। সাহেবের প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে নানা রকমের 'সংগ্রহ' ঠাসা থাকত—তাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর দেব-দেবীর প্রস্তর মূর্তিও ছিল। কারও কারও মতে সাহেব জ্ঞানী, গুণী, নইলে অমন পাগলা হয়?

সে যাই হোক, এ ভি সাহেব অসহযোগ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সারা শহরে ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের মতিগতি ফেরাবার জন্য তিনি সদুপদেশ দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কান দিল না।

শত চেষ্টা করেও এ,ডি সাহেব এ আন্দোলনের মোড় ফেরাতে পারলেন না। অসহযোগের বন্যায় সব ভেসে গেল। কিছুকালের জন্য জনসাধারণের সে কী উৎসাহ উদ্দীপনা! ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার সময় নেই কারও। কিন্তু বাস্তব জগতে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়া সামলান দায়। আমরাও ঐ বন্যায় ভেসে গিয়েছিলাম। ন্যাশন্যাল এডুকেশন, কোথায় সে বস্তু? অসহযোগের পাণ্ডারা মাথা ঘামিয়ে যে বস্তু দাঁড় করালেন তার নামটাই শুধু ন্যাশন্যাল। নাম বাদ দিলে যা চোখে পড়ে তা অন্তঃসারশূন্য অর্থাৎ ঐ ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল-কলেজেরই এডুকেশন। এই কলকাতা শহরেই তার চেহারা দেখে গিয়েছিলাম স্বচক্ষে। কারণ, ইতিমধ্যেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে গিয়ে মনে হল একূল ওকূল দুকূল বুঝিবা গেল।

আমি তখন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই সময়কার কথা বলছি। আমাদের হোস্টেলের অদূরেই ছিল একটা বিরাট স্কোয়ার। সেই স্কোয়ারের চারিদিক ঘিরে সরকারি সব বড় বড় অফিস, হোমরা-চোমরাদের এমন কি এ ডি সাহেবেরও কোয়ার্টার বিরাজিত ছিল। একদিন আমার কলেজের দুই বন্ধু অনন্ত ওরফে সেঁচু বাগচি এবং ভূপেন পাণ্ডে আর আমি স্কোয়ারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করছি এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক নগ্নপদ ব্রাহ্মণ। পরণের ধুতি তাঁর দুটি হাঁটু ঢেকে রেখেছে, গান্ধীজির মত হাঁটুর উপর তোলা নয়। গায়ের উড়ানির ফাঁক দিয়ে শুভ্র পৈতাটি উকি মারছিল। আমার দুই বন্ধুরই পরিচিত তিনি। সব একই জিলার লোক। বন্ধুদের বাড়ি সানগোলায়। কথাবার্তা শুরু হতেই ব্রাহ্মণের কথার ঢং এমন মনে হল যে, আমাদের পরিচিত মহলে তা একেবারে দুর্লভ। বন্ধুরা ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিল। বললে—ইনিই 'জঙ্গীপুর সংবাদ' এর সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে দা-ঠাকুর।

দা-ঠাকুর বললেন আমার দিকে তাকিয়ে—আমি কিন্তু না পড়ে পণ্ডিত, ভাই। লোকে পড়াশুনা করে বিদ্যা দিগ্‌গজ হবার পর ঐ রকম একটা কিছু উপাধি পায়—যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমার বিদ্যার বহর নেই, তবু ঐ ল্যাজটা টেনে নিয়ে বেড়াই পৈত্রিক সূত্রে পাওনা হিসাবে।

দা-ঠাকুরকে চাক্ষুষ দেখলাম এই প্রথম। তার আগে সেঁচু বাগচি তাঁর একখানি সাপ্তাহিক 'জঙ্গীপুর সংবাদ' একদিন আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল। তাতে গোটা তিনেক কবিতা আর বাকি প্রায় তিন ভাগ অংশে নিলাম ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন ছিল। অদ্ভুত মুখরোচক কবিতা—একটিতে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে

যোক্ষম কষাঘাত, আর একটিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির শ্রাদ্ধ। পড়ে খুব উপভোগ করেছিলাম।

অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কা খেয়েও আমাদের তথাকথিত এডুকেশনের জন্য আগায় মাথা মুড়িয়েছি—দা-ঠাকুর এ ডি সাহেবের কাণ্ডকারখানা সবই লক্ষ্য করেছিলেন, এবার আমাদের দশাও লক্ষ্য করলেন। আমরা বলেছিলাম গোলামখানায় আর ঢুকব না, কিন্তু আবার গোলাম হবার দিকে আমাদের ঝোঁক দেখে বেশ ক থা বসিয়ে দিলেন। আমাদের এডুকেশন কি ভাবে আরম্ভ হয় আর তার পরিণতি কোথায় তা তাঁরই ভাষায় বসিয়ে বলে গেলেন। সবগুলি ইংরাজি 'সন'-অন্ত শব্দের মালা যেন এবং সবেরই মধ্য দিয়ে একটা ভাবের সূত্র চলে যাওয়ায় শেষটায় একটা প্রস্ফুট অর্থ পাওয়া যায় অবলীলায় এতগুলি শব্দ নিয়ে খেলা করতে ইতিপূর্বে আর কাউকে দেখি নি, অথচ ওরই মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছুরি চালিয়ে গেলেন। বললেন—আমাদের সব কাঁচের চোখ ভাই! আমরা আমাদের এডুকেশনকে ন্যাশনাল বলে চালাতে চাই—এই ধাঁচ দেখে বুঝতে পার না? সত্যিকারের চোখ ফুটতে আরও কতকাল কাটবে কে জানে!

এমন সময় হঠাৎ চারদিকে একটা গমগমে ভাব প্রকাশ পেল। কোথায় ছাড়িয়েও আরও কতদূর লাল পাগড়ির দল ইতিমধ্যে মোতায়েন হয়ে গিয়েছিল তা লক্ষ্য করি নি—দা-ঠাকুরের কথায় এতই মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। একটু বাদেই একজন লালমুখো গোরা মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে বড় রাস্তার বুক কাঁপিয়ে চলে গেল, অতঃপর সৈনিক বেশধারী দুজন অশ্বারোহী তার পিছু পিছু চলল তালে তালে, ঐ না আসছে একখানা প্রকাণ্ড জাঁকালো মোটর? দণ্ডায়মান লালপাগড়িদের মিলিটারি কায়দায় সেলামের সঙ্গে পায়ের বুটের খটখট। বুঝলাম মোটরের আরোহী একজন কেউকেটা! শাঁ করে মোটরখানা অদূরেই আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। দেখলাম মোটরের আরোহী একজন লালমুখো সুপুরুষ। দা-ঠাকুর বললেন—একেবারে হার্টের ওপর দিয়ে চলে গেল হে! ঐ সুপুরুষটি বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে! উনি শুধু সুপুরুষ নন সুপণ্ডিতও—'দি হার্ট অব আর্যাবর্ত' গ্রন্থের লেখক।

আমি বললাম—বেশ দেখতে তো।

দা-ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে বললেন—তুমি দেখছি প্রেমে পড়ে গেলে।

এর বছর পাঁচেক পরে দা-ঠাকুরকে দেখলাম নবরূপে। কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে খালি পায়ে কাগজ বিক্রি করতে। তাঁরই নিজস্ব কাগজ

বিদূষক আর বোতল পুরাণ—দুখানিই সাপ্তাহিক। গলায় ঝুলান বোতল-পুরাণখানা গায়ের উড়ানির ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে আর ডান হাতে বিদূষক। মুখে ছড়া কাটছেন। সে ছড়া হয় বোতল পুরাণের নয়ত বিদূষকের অন্তর্ভূত।

দা-ঠাকুরকে প্রায়ই দেখতে পেতাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে। কখনও কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোডের মোড়ে, কখনও কলেজ স্ট্রীট-বৌবাজারের মোড়ে আবার কখনও বা শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে হ্যারিসন রোড সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে।

আমার ডেরা যে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ওপর, দা-ঠাকুরের তা জানা ছিল। একদিন বেলা তখন প্রায় এগারোটা। দা-ঠাকুর মোড় থেকে উঠে এলেন আমার এখানে।

গলা থেকে বোতল পুরাণখানা আর বগলে রাখা কাগজগুলো সব টেবিলের ওপর রেখে বললেন—ইস, রোদ্দুরটা বেশ চড়েছে। নিচের রাস্তায় নামতে গেলে পা পুড়ে যায়। পারতপক্ষে ফুটপাথ থেকে নামি না, তবু এধার ওধার করতে গেলে তো রাস্তায় নামতে হয়। ঐ সময় একটু বেকায়দায় পড়ি।

গরমিকাল দুপুরে আমরা গলদঘর্ম হয়ে পড়ি। দা-ঠাকুরকে কখনও গলদঘর্ম দেখি নি। বড় জোর তাঁর কপালে ও কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যেত।

এত কষ্ট করে পয়সা উপার্জন করছেন দা-ঠাকুর, কেন, কিসের জন্য? জিজ্ঞেস করলাম।

—কেন, পেটকোবাস্তে! নিজের পেটে একটা চপেটাঘাত করে বললেন—আর শুধু এই পেটটাই নয়, ভেট দিতে হয় অর্ধাঙ্গিনীকে আর তস্য বাচ্চাগুলোকে! তোমরা পাখার তলায় বসে দিব্যি আরামসে কলম চালাও, আর আমার কপাল মন্দ, তাই কলম চালাই, টাইপ সাজাই, কম্পোজে মাথা ঘামাই, প্রেসে হাত লাগাই, কাগজ ছাপাই, পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তাতেই পেট, তাতেই ভেট। বেশ একটু কষ্ট হয় বৈকি ভাই। বুঝি সবই কিন্তু করব কি? করার যে কিছুই নেই। আড়ালে থেকে একজন পুতুল নাচ নাচাচ্ছেন, তাই নেচে যাচ্ছি। এই চোখ দুটি যেদিন বুজে যাবে সেদিন আমার অবলা বঙ্গকুলবধূর না-বলা এই কথাগুলো হয়ত শুনতে পাবে।

বলেই দা-ঠাকুর তাঁর এক গালে ডান হাতখানি লাগিয়ে অবিকল মেয়েলি ঢঙে মায়াকান্না শুরু করলেন—

ওগো, তুমি তো চলে গেলে,

আমার জন্যে কি করে গেলে গো ?

আমি কার মুখ চেয়ে বেঁচে

থাকব গো ?······বাবা, বাবা

তোমার বাচ্চারা যে পথের ভিখারি

হল গো ?······বাবা বাবা

আমি কি পাপ করেছিলাম যার জন্যে এই সাজা গো···বাবা নন

উঃ—হু-হু-হু !···বাবা, বাবা

তুমি যাবার আগে আমতেল দিয়ে

মুড়ি খেতে চেয়েছিলে গো,

উঃ ! হো-হো হোঃ আহা,

আমি দিতে পারিনি,

(বক্ষে চপেটাঘাত),

আমার কেন আগে মরণ হল না গো ?···বাবা, বাবা ! ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে আরও তিন-চারজন বন্ধু এসে আমার পাশে বসেছিল। সকলেই দা-ঠাকুরের চেনা। সবারই হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল।

একটু সামলে নিয়ে সবাই যখন ধাতস্থ হয়েছি তখন দা ঠাকুর আবার শুরু করলেন—আরে ভাই, সেদিন এক বিপদে পড়েছিলাম। বাড়ি যাব বলে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় আমার এক আত্মীয়—ধর মাসতুত ভাই একটা প্রকাণ্ড স্যুটকেশ নিয়ে আমার কামরায় উঠে বললে ওটি তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। বললাম বেশ। আমরা মফস্বলের লোক, এমন সুযোগ পেলে কেউ কি ছাড়ে ? আমি যদি এ সুযোগ পেতাম তা হলে ছাড়তাম কি ? মাসতুত ভাই শুনে বাংলার প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে ওটা মিলিয়ে দিও না যেন। যা হোক গোটা তিনেক স্টেশন পেরিয়েছি এমন সময় দুজন চেকার উঠল আমাদের কামরায়। টিকেট চেক করার পর দুজনের শ্যেন দৃষ্টি পড়ল সব মালের দিকে। হাত-পা দুজনেরই সমান চলতে লাগল। কখনও বাঙ্কের ওপর, কখনও বেঞ্চের তলায় উঁকি-ঝুঁকি মারে। একসময় আমার ঐ স্যুটকেশটায় বুটের ঠোক্কর মেরে একজন চেকার জিজ্ঞেস করলে—এ মাল কার ? বললাম—আমার মশায়।

বুক করেছেন ?

—না তো।

—এর জন্যে ভাড়া দিতে হবে। আধ মনের ওপর ওজন, তিরিশ সের তো বটেই।

—ভাড়া পাব কোথেকে? মালের মালিক তো নেই থাকলে না হয় একটা সুরাহা হত।

—এই যে বললেন মাল আপনার?

—হাঁ, আমার। সঙ্গে যখন রয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করার পর চেকার মশায় তাঁর পকেট থেকে কপিকলের মত একটা মাপ-যন্ত্র বার করে স্যুটকেশটা ওজন করতে উদ্যত হলেন। হাত জোড় করে অনুনয়-বিনয় করে বললাম—মশায়, গরিব ব্রাহ্মণ, পয়সার মালিক হলে কি আর ভাবনা ছিল! ধরুন না, বাগমারি থেকে পায়ে হেঁটে হাওড়ায় এসে কোন রকমে টিকেটখানা কেটে এই গাড়িতে উঠেছি বাড়ি যাব বলে, এমন সময় এক আত্মীয় এসে তার মালটি গছিয়ে গেল আমার কাছে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে। মালটি কি ফেলে দেব? আপনি হলে পারতেন? দেখছেন এই টিকেটখানা ছাড়া আমার সম্বল আর কিছুই নেই। পোঁটলা-পুঁটলি বলতে আমার ট্যাঁক। ট্যাঁকে একটি পয়সাও নেই, রাখলে গরম হয়, তাই পারতপক্ষে রাখি না। তবে একটা রফা হতে পারে।

If you don't mind, I will pay in kind.

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। বললেন—তার মানে?

—মানে আমি একটা গান শুনিয়ে দেব। কোন ভিখারি গায়ক যদি গাড়িতে উঠে একটা ভজন শুনিয়ে দেয় তবে যাত্রীরা তাকে দু-চার পয়সা দেয় না কি? আমি না হয় একখানা গজল গাই, তার জন্যে কিছু পাব তো। তাই নিয়েই আপনার মালের মাশুল উশুল হয়ে যাবে।

চেকার মশাই দা-ঠাকুরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, মুখে তাঁর হাসি। অদ্ভুত লোক, অদ্ভুত এই দা-ঠাকুরের কথার ভঙ্গী, কেবলই শুনতে ইচ্ছে করে।

দাঠাকুর গান ধরলেন গজল সুরে—

হাওড়া লিলুয়া বেলুড় বালি
উত্তরপাড়া কোন্নগর।
রিসড়া শ্রীরামপুর শেওড়াফুলি
বৈদ্যবাটি ভদ্রেশ্বর॥ ইত্যাদি

পর পর স্টেশনগুলির নাম একটা যুৎসই মিলের সঙ্গে ছন্দ গেঁথে দা-ঠাকুর গেয়ে গেলেন। গাড়ির আরোহীরা এবং সেই সঙ্গে চেকারবাবু প্রচুর আনন্দ উপভোগ করলেন। মালের মাশুল উশুল করা আর হল না। দা-ঠাকুরের গন্তব্য স্থান কোথায় তাও তিনি তাঁর গজল গানে প্রকাশ করলেন—

মুনিগ্রাম গনকর পেরিয়ে
জঙ্গীপুর রোডে আমার ঘর।

দা-ঠাকুর যথাস্থানে নামতে গেলে চেকারবাবু মহা খুশি হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

দা-ঠাকুর হেসে বললেন—দেখলে ভাই, কলির ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর এখনও দাম আছে।

দিল্লীতে সে সময় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছিল। বাংলাদেশ থেকে 'বিগ ফাইভ'-এর দুজন চাঁই নির্মলচন্দ্র চন্দ্র আর তুলসী গোঁসাই (স্বরাজ দলের সভ্য) অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। নির্মলচন্দ্র দা-ঠাকুরকে নিয়ে গেছেন দিল্লীতে তাঁর বাসায়। অমন মজাদার সঙ্গ নির্মলচন্দ্র ছাড়তে চাইতেন না। দেশবন্ধু-মতিলালের স্বরাজ দল তাঁদের কল-কৌশল ও বক্তৃতার তোড়ে সারা ভারতবর্ষে বিলেতি গভর্নমেণ্টের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা খবরের কাগজে তখন সরকারি মুখপাত্রদের সঙ্গে আমাদের স্বরাজ দলের বাকযুদ্ধ যা হত তা প্রাণভরে উপভোগ করতাম। বিশেষ করে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও তুলসী গোঁসাইয়ের 'রিটর্ট' অর্থাৎ উত্তরের প্রত্যুত্তর ছিল যেন অব্যর্থ শরসন্ধান।

দা-ঠাকুর দিল্লী থেকে ফিরে এসেছেন। তার কিছুদিন বাদেই আমাদের এখানে। দা-ঠাকুরকে বললাম—আপনি তো দিল্লীর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন, একটু প্রসাদ আমাদের দিন না। নির্মলচন্দ্রকে আমরা বলতাম 'আলবোলারাজ'। তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ি থেকে তাঁর আলবোলায় টানা অম্বুরি তামাকের গন্ধ ভেসে আসত একেবারে রাস্তায়। খুব মজলিসি লোক ছিলেন তিনি। দিল্লীতেও তাঁর বাসায় মজলিস বসত নিশ্চয়?—জিজ্ঞেস করলাম দা-ঠাকুরকে। দা-ঠাকুর বললেন—নিশ্চয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় রজরসীদের নিয়ে রঙ্গরস করতে হত। নির্মলের জ্বালায় একদিন মাতালের অভিনয়ও করেছি। সবাই ছিঃ ছিঃ করে ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগলেন। আগে কি তারা জানতেন যে, এই বর্ণচোরা লোকটি খাঁটি ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করে। সে যা হোক, একদিন নির্মল আমাকে এসেমব্লিতে নিয়ে গেল। সেদিন স্যার বেসিল ব্ল্যাকেটের বাজেট

বক্তৃতা। সেনা ও নৌ-বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করে তা সভ্যদের দ্বারা পাশ করিয়ে নেবার সপক্ষে গাইতে লাগলেন।

স্বরাজী দল ঐ ব্যয়-বরাদ্দ থেকে এক টাকা কর্তন করার প্রস্তাব তুলে ওটা না-মঞ্জুর করার মনোভাব জানালেন। উভয় পক্ষের তুমুল বাদানুবাদের পর স্যার বেসিল বললেন—কিন্তু কেন?

তুলসী গোঁসাই—Because we are not going to feed the white ants any more.

স্যার বেসিল—Is it possible for the Indians to protect their own country?

তুলসী—Indians can protect the country of others while they cannot protect their own. Have you forgotten those days of yours when you fell into the Ditch? Who saved the situation in that crucial moment? Are they not the Indian Gurkhas and Shiks?

স্যার বেসিল—Had it been the case, Indians would not have been governed by us.

তুলসী—My dear Sir, this is certainly our bad luck that we are being governed by your ruffians!

তুলসী গোঁসাই সাধারণত অতি বিনয়-নম্র অমায়িক লোক ছিলেন। কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি যে একজন চোস্ত শিকারি তা প্রমাণ করে দিতেন। স্যার বেসিল খাস ইংরেজ আর তুলসী গোঁসাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ঐ ইংরেজের দেশেই—তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ—একেবারে খাঁটি অক্সোনিয়ান। আশ্চর্য দা-ঠাকুরের স্মরণশক্তি আর আশ্চর্য তাঁর নকল করবার ক্ষমতা। এসেমব্লির ঐ বাঘা বাঘা দুই পাণ্ডার গলার স্বর, তাঁদের উচ্চারণ-ভঙ্গি ও বলার ঢং—সবকিছু তিনি হুবহু নকল করে এনেছেন।

এইবার এলেন শচীন সেনগুপ্ত পাঞ্জাবি গায়ে উড়ানি উড়িয়ে। হাতে তাঁরই স্বরচিত, সন্ত প্রকাশিত একখানা 'গৈরিক পতাকা' নাটক। বেশ খুশি খুশি ভাব দেখলাম শচীনদার। আমার দিকে চেয়ে বললেন—পাবলিসার পাঁচশো টাকা দিল হে। ওতেই ছেড়ে দিলাম একটা সংস্করণ।

বুঝলাম তাঁর দেনার অনেকটা অংশ এবার শোধ হয়ে যাবে। দা-ঠাকুরের

দই-সন্দেশ অনেক বিলি হয়ে গেছে জেনে শচীনদা একটু আফশোস করলেন। তারপর মনোমোহন থিয়েটারে তাঁর নাটকটা কেমন চলছে তার কথা দা-ঠাকুরকে শোনালেন। একদিন দা ঠাকুরকে তিনি তাঁর নাটকের অভিনয় দেখবার জন্যে নিয়েও গিয়েছিলেন।

একথা ওকথা হবার পর হঠাৎ এক সময় শচীনদা বললেন—দা-ঠাকুর, একটা কথা বলব?

—বল, হঠাৎ সংকোচের এমন বিনয় কেন? নিঃসংকোচেই বল না।

—আচ্ছা, আপনি তো আপনার বামনিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে মেয়েদের একটা পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করেন। বহু নারী-পুরুষের সঙ্গে আপনি মিশেছেন, কিন্তু এমন কোন নারীর সংস্পর্শে কি আপনি এসেছেন যাঁকে আপনার সত্যি ভাল লেগেছে?

—বুঝলাম তোমার প্রশ্ন। ভাল লাগার অর্থে তোমরা কি বোঝ তা আমি বুঝি। তবু বলব, হ্যাঁ, ভাল লেগেছে, নিশ্চয় ভাল লেগেছে একটি মেয়েকে। বলছি তার কথা, শোন। তারপর তোমার অর্থের সন্ধান কিছু পাও কি না তার মধ্যে দেখ।

মেয়ে বলব না, বলব ভদ্রমহিলা। এই ভদ্রমহিলা অতি বর্ধিষ্ণু ঘরের কুলবধূ। কপালের দোষে বিধবা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। আর যেমনি রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। দুধে আলতা রঙের নিটোল দেহ দিয়ে যেন তেল গড়িয়ে পড়ত। একটা সত্যিকারের আভিজাত্যের ছাপ ছিল তাঁর চেহারায়।

আমার বাসার অদূরেই তাঁদের বাড়ি। প্রতিবেশী যদি খুব কাছাকাছি থাকে তবে ঘনিষ্ঠতা সহজেই হয়। তিনি মাঝে মাঝে আমার এখানে চলে আসতেন, আর সেটা দুপুরের দিকেই বেশি। বোধ হয় ঐ সময় তাঁর অবসর থাকত প্রচুর। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সব বিষয় জানবার, বুঝবার আগ্রহের মধ্যে তাঁর একটা স্বচ্ছ আন্তরিকতা লক্ষ্য করতাম। আমি আমার কাগজের পুরানো ইতিহাস তাঁকে বলতাম। কি করে আমার প্রেসে নিজেই টাইপ সাজিয়েছি, কম্পোজ করেছি, ফর্মা এঁটেছি এবং কাগজ ছেপেছি—সবই তাঁকে শুনিয়েছি, সব বিষয়েই তিনি উৎসুক হয়ে শুনতেন আর প্রশ্নও করতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য আমাকে তাঁর প্রশ্নের জবাবও দিতে হত।

একদিন বললেন—কী ভাল লাগে আপনার কাজের কথা শুনতে। আচ্ছা, এত কাজ আপনি একাই করেন কেন? কোন লোক নেই আপনাকে সাহায্য করবার?

বললাম আমি একাই একশো যে। তা ছাড়া একা সব কাজ করার সামর্থ্য থাকলে তা করতে যে কী আনন্দ তা বোঝানো যায় না।

মহিলাটি বললেন—আপনার এই সব কাজ আমি যদি একটু শিখতে পারতাম! দুপুর বেলাটি আলসেমি করে বিশ্রী লাগে। তবু একটা কাজ নিয়ে থাকতাম। আচ্ছা, একটা কাজ করুন না। একটা বড় ছাপাখানা করে ফেলুন। টাকা যা লাগে আমি দেব। সে জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমিও কিছু কাজ করব। আমার হবে শখের কাজ। কলকাতাতেই থেকে যখন আপনাকে উপার্জন করতে হয় তখন এতে আপত্তি কি?

বলেন কি ভদ্রমহিলা! এমন দুঃসাহস তো দেখি নি কোন মেয়ের। অথচ অত্যন্ত সহজ ভাব। নিঃসঙ্কোচে কথাগুলি বলে গেলেন।

বললাম, আমি কারও ঋণ নিই না। এই তো বেশ আছি। দুটো হাত আর দুখানি পা এবং এই দুটো চোখ যতদিন আছে ততদিন দুঃখ-কষ্ট করে চালাতে আমার ভারি আনন্দ। ঐশ্বর্যের স্বাদ পেয়েছি কি মরেছি। ভগবান সে জন্য আমায় এই দুনিয়ায় পাঠান নি।

—ঋণ আপনাকে কে বলছে? টাকাটা আপনাকে দিতে পারলে আমার কী যে আনন্দ হবে! আপনাকে আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি। আপনার কথা শুনি, আপনার কাজ দেখি আর আপনার কাগজ পড়ি। সবটার মধ্যে আছে একটা নিবিড় আনন্দ!

বলেই মহিলাটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলেন। অবাক হয়ে তাঁর দিকে মুহূর্তের জন্য চেয়ে রইলাম। তাই বলে মনে কর না শচীন, তোমার নাটকের সেই বীরাবাঈ-এর মতন……

দা-ঠাকুর এই সময় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাঁর গায়ের উড়ানিখানার এক অংশ দিয়ে গোঁফ জোড়াটি ঢেকে একটা আধ ঘোমটা করে ফেললেন এবং অপর অংশ হল আঁচল। প্রণয়িনী নারীর ঢঙে হাত নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগলেন—

এই কাননের ফুল নিয়ে যাও
আমার আঁচল থেকে
এস পথিক কমল-কুঁড়ির
পরাগ-আতর মেখে!
পরাগ-আতর মেখে।

(বার বার পুনরাবৃত্তি)

দা-ঠাকুরের এই মেয়েলি ঢঙের গান ও নাচের দৃশ্য যারা চোখে দেখে নি তাদের পক্ষে এর পূর্ণ রস উপভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। অপূর্ব সে অনুকৃতি। সকলেই আমরা হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

দা-ঠাকুর এর পর বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বেদনা-জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

এর কিছুদিন বাদে মহিলাটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি আকুল হয়ে দুদিন লোক পাঠালেন। আমি যাই নি। তৃতীয়বার তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পারি নি। তিনি জানিয়েছেন তাঁর অন্তিম ইচ্ছা আমি যেন একবারটি তাঁর ওখানে যাই।

গিয়ে দেখি মহিলাটি তাঁর ঘরের মেঝেতে শয্যাশায়ী। সে রূপও নেই, সে স্বাস্থ্যও নেই। ক্ষীণ হাত দুখানি জোড় করে ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় বললেন—আমি এই বাড়িখানি আপনার নামে উইল করে দিয়ে যেতে চাই। আপনি দয়া করে শুধু অনুমতি দিন, তা হলেই আমি সুখে মরতে পারব।

আমি জানতাম এই বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় তাঁর আরও তিনখানা বাড়ি আছে। তা থাকুক, তাতে আমার কি?

রোগিণীকে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম—আমি এ ব্যাপারে তো সম্মতি দিতে পারি না। লোকে প্রয়োজন হলেই চাইতে পারে কিংবা নিতে পারে কিন্তু আমার কোনই প্রয়োজন নেই। ক্ষমা করুন আমাকে।

—কোনই প্রয়োজন নেই আপনার? কিন্তু আমার যে প্রয়োজন ছিল। আপনি রাজি হলে মনে করতাম এত বড় পুণ্যসঞ্চয় বোধ হয় আর কিছুতেই করতে পারব না। আপনি রাজি হবেন না তাও জানতাম, তবু মন যে মানে না।

কথাগুলো বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি ইঙ্গিতে আমাকে তাঁর মাথার কাছে এগিয়ে যেতে বললেন। আমি এগিয়ে যেতেই দুটি ক্ষীণ হাতের আঙুল দিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন—আশীর্বাদ করুন যেন শান্তিতে যেতে পারি।

দা-ঠাকুর তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। শচীনদা কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। দা-ঠাকুর বললেন—কি শচীন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। ভাবছ সবটাই আমি বানিয়ে বললাম? তোমার বিশ্বাস না হলে আমি তো আর জোর করে তোমায় বিশ্বাস করাতে পারি না।

১৪

কবি-বন্ধু সুবোধ রায় খবরের কাগজে আমার সহকর্মী ছিল। তারও অনেক আগে সে কিছুকাল ছিল কবিগুরুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কত কথাই শুনতাম তার মুখে মুগ্ধ হয়ে মোহাচ্ছন্নের মত। এইখানে ছিল নাকি দিগন্তবিস্তৃত এক বিশাল প্রান্তর যেখানে দুটি ছাতিম গাছ ছাড়া আর কোন বৃক্ষলতাদি নয়নগোচর হত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বিশাল মরুভূমিসম প্রান্তরেই বিরাটের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর অন্তরের চৈতন্যপুরুষ এই অসীম নিশ্চল নীরবতার মধ্যে বিরাটকে উপলব্ধি করবার নির্দেশ যেন চকিতে দিয়ে গেলেন—এই তো অচিন্ত্য অব্যয় দুরধিগম্যের মাঝে নিজেকে বিলীন করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

মহর্ষির চোখের স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধরে উঠল। ঐ ছাতিম যুগলের পাদদেশে বেদী নির্মাণ করে সেইখানেই পাতলেন তিনি তাঁর ধ্যানের আসন। বাসের জন্যে নতুন একটা দোতলা কোঠাবাড়িও তৈরি হল।

ঐ আদিম কোঠাবাড়ির উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে সব লাল কাঁকরের পথ। কোনটার দুধারে আমলকী গাছের সারি, কোনটার দুধারে শালের গাছ, আবার কোনটায় বা রূপ নিয়েছে আমের বীথি। উত্তরের ঐ লাল কাঁকরের পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা উপাসনা মন্দির। অতীতের তপোবনেরই যেন নব রূপায়ণ।

এই তপোবনের আবহাওয়ায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এসে আশ্রয় নিলেন। আম-জাম-কাঁঠাল-পেয়ারা আমলকী বাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় তাঁর বাসস্থান নির্মিত হল। কবিগুরু এইখানেই তাঁর জীবনের আদর্শকে ফুটিয়ে ফলিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন। ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মার ভাবরাশির মণিমঞ্জুষা।

বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের পাশেও একে একে এসে দাঁড়ালেন রত্নরাজি—বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, জগদানন্দ রায়, নেপাল রায়, অজিত চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ ইত্যাদি। এঁরা ছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।

ঐ সব অধ্যাপকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুবোধ রায় আমাকে যে সব কথা শোনাতেন তাতে আমি আকৃষ্ট হয়ে চলে যেতাম যেন আশ্রমের শালবীথিকা ধরে আম্রকুঞ্জে বা আমলকীর বনে বনে। হয়ত দেখতাম পণ্ডিত বিধুশেখর তাঁর কুটিরের প্রান্তে রন্ধনরত। আলোচালের মধ্যে দুটি আলু বা কাঁচকলা এবং

সেই সঙ্গে ফর্সা ন্যাকড়ায় বাঁধা খানিকটা সোনা মুগের ডাল ফেলে দিয়েছেন। সাদাসিধা নিরামিষ খাওয়া—স্বপাকে। সিদ্ধপকই খেতেন বারো মাস। ঐ সঙ্গে একটু খাঁটি গব্যঘৃত ও কিছুটা গোদুগ্ধ। কোথায় লাগে এর কাছে আমিষ আহার! আমি বলতাম ওতো দেব ভোগ্য, অকপটে স্বীকার করছি গব্যঘৃতের গন্ধটা যেন নাকে এসে জিবে জল ঝরাত। আরও একটা কারণ ছিল বোধ হয় এই অঘটন ঘটার পিছনে। ছোটবেলায় ঠাকুরমার দুপুরের আহার গড়িয়ে দাঁড়াত বৈকালিক আহারে। শ্বেতপাথরের থালায় আহার করতেন তিনি। আলোচালের সঙ্গে কিছু সিদ্ধপক, কিছু বা ঘৃতপক নিরামিষ তরকারি; আর সেই সঙ্গে দুধটা মেরে প্রায় ক্ষীরটা করা। নিত্য ডাক পড়ত আমার আর আমার এক জ্যেঠতুত ভাইয়ের ঠাকুরমার শেষপাতের প্রসাদ গ্রহণ করতে। শ্বেতপাথরের সংস্পর্শে এসে দুধভাতটুকু আরও মধুর হত কিনা কে জানে! ঠাকুরমার সেই শেষপাতের প্রসাদের স্বাদ শাস্ত্রীমশায়ের নিরামিষ আহার্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমার জিহ্বা রসসিক্ত করে তুলতো বোধ হয়।

শাস্ত্রীমশায়কে আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখেছিলাম এই কলকাতা শহরেই রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে। স্বস্তিবাচন করেছিলেন তিনি সংস্কৃতে। রবীন্দ্রনাথের মুখেও প্রথম শুনলাম তারপর সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কী মধুরই লেগেছিল তাঁর ছোট্ট সংস্কৃত ভাষণটি! প্রতিভাধরের কি সব দিকেই প্রতিভা!

ছোট্ট-খাট্টো শীর্ণ এই মানুষটি—শাস্ত্রীমশায়। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক, কর্মঠ ব্রতচারী। শান্ত, আত্মপ্রত্যয়শীল, নিন্দা প্রশংসার অতীত। কবিগুরুর বারো জাতের আশ্রমের মধ্যেও এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁর শালগ্রাম শিলাকে ধরে রেখেছিলেন নিভৃতে। অথচ ছিল না তাঁর কোন জাত্যাভিমান। সব ধর্মের প্রতি তাঁর সমান শ্রদ্ধা। তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বিধুশেখরকে কবিগুরু বলতেন শাস্ত্রীসাগর। বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন তিনি, এমন কি জার্মান ভাষায়ও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত।

ক্ষিতিমোহনকে দেখেছিলাম এই কলকাতা শহরে আমার মেসে। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ পুরুষ। বাহ্যত গুরুগম্ভীর হলেও কথাবার্তায় স্বতঃ রসের নির্ঝর। তাঁর ভাইপো শঙ্কর সেন থাকতেন আমার ঘরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন প্রশান্ত মহলানবিশের সংখ্যাবিজ্ঞানের অনুশীলন শুরু হয়েছে, সেই সময় থেকে এযাবৎকাল

তিনি মহলানবিশের সঙ্গ ছাড়েন নি। অসীম নিষ্ঠা দেখেছি এই শঙ্কর সেনের, মহলানবিশের হাতে-গড়া কৃতী কর্মী।

ক্ষিতিমোহন বার দুই এসেছিলেন আমাদের মেসে। দুবারই দেখেছিলাম তাঁর বগলে কাপড় দিয়ে জড়ান একটা পুঁটুলি—যেন কমলাকান্তের দপ্তর।

শঙ্কর সেন বললেন—জানেন ঐ পুঁটুলিতে কি আছে।

—কি আছে?

—আছে বেলসুট। অর্থাৎ কচি বেলকে চাকা চাকা করে কেটে শুকিয়ে নেওয়া। কাকা যেখানেই যান ঐ বেলসুট থাকে সঙ্গে। সকালে গরম জলে দুচারখানা বেলসুট ভিজিয়ে নরম করে খেয়ে নেন। তাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যায়।

যাক সে কথা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তপোবনের মধ্যে আর একটি নিভৃত তপোবন ছিল, সেখানে বাস করতেন কবিগুরুর সর্বাগ্রজ 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কবি দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাল-আমলকী-কনকচাঁপা-মহুয়া মাধবীলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রায় সব সময় একখানা চেয়ারে বসে থাকতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। বসে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন না তিনি। সব সময়ই তাঁর হাতে থাকত কাজ। হয় দার্শনিক কোন প্রবন্ধ লিখছেন, নয় তো অঙ্ক কষছেন কিংবা কোন গভীর বিষয়ের গবেষণায় চিন্তামগ্ন। চিন্তারাজ্যের কঠোর শ্রম থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আবার কাগজের বাক্স তৈরি করার খেলায় মন দিতেন এই শিশু-সরল ব্যক্তিটি।

আমরা তাঁর গবেষণার ফল ভোগ করেছি কিছুকাল। খবরের কাগজের সংবাদই বলুন কিংবা কোন মনীষী বা নেতা-উপনেতার বক্তৃতাই বলুন সবই আমরা পেতাম ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে তা আমাদের বাংলা কাগজে প্রকাশ করা হত। এতে মূলের সঙ্গে অনুবাদের রূপের তফাৎ শুধু নয়, সৌন্দর্যেরও হানি হত। বাংলায় যদি ইংরেজির মত সর্টহ্যাণ্ড রীতির প্রচলন থাকত তবে এ দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হত না। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই অভাব পূরণ করেছিলেন তাঁর রেখাক্ষর উদ্ভাবন করে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ইংরেজি থেকে অনুবাদ করলে তার রস ক্ষুণ্ণ হত। সুতরাং বাংলায় রেখাক্ষর রীতি অনুযায়ী যদি তার অনুলিখন সম্ভব হয় তবে তাই কর্তব্য। রবীন্দ্রভক্ত সুভাষচন্দ্র তাই আবিষ্কার করেছিলেন এক রিপোর্টারকে—তাঁর নাম ইন্দ্রবাবু। তাঁকেই সুভাষচন্দ্র নিয়োগ করলেন আমাদের বাংলা কাগজে। ভদ্রলোক দ্বিজেন্দ্রনাথের রেখাক্ষরের সঙ্গে নিজেরও প্রতিভায় কিছু

সংযোগ করেছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভাষণেরই তিনি অনুলিখন করতেন এবং করতেন চমৎকার। রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত খুশি হয়ে এই রিপোর্টারের ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই শিশু-প্রকৃতির মানুষটি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় তাঁর তপশ্চর্যায় মগ্ন থাকতেন। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেন কন্বমুনির আশ্রমের আবহাওয়ায় তিনি বাস করতেন। চারিদিকে তাঁর গাছপালার সবুজের মেলা; অসংখ্য পক্ষিকুল তাঁকে ঘিরে খেলা করত। মহুয়া গাছের গুঁড়ি বেয়ে নেমে আসত কাঠবিড়ালিরা; কলরব করত অসংখ্য দোয়েল-শ্যামা-চড়াই-শালিকরা। কেউবা বসত তাঁর মাথায়, কেউবা কাঁধে, কেউবা হাতে, হাঁটুতে। ঋষি নীরবে তাদের ভালোবাসার অত্যাচার সহ্য করতেন, হাসতেন মৃদু মৃদু। এ বিমল আনন্দ কোথায় পাওয়া যায়!

পাখিদের নিত্য খাবারের বরাদ্দ ছিল। তাঁর বিশ্বস্ত ও একান্ত অনুরক্ত ভৃত্য মুনীশ্বর এসবের ব্যবস্থা করত। পাখিরাও ছিল নিরুদ্বেগ। এখানে ওখানে চুরি করে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে তাড়া খাওয়ার চেয়ে এখানে নির্ভয়ে খাওয়ার আনন্দ অনেক।

একদিন পাখিরা খুবই কলরব শুরু করেছে। ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোকর আর পাখার ঝটাপট শব্দ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। ঋষি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তাদের খেলা। খেলাটা বেশ জমেছে। দুটি শালিকের জড়াজড়ি করে ঝটাপট খেলা চলছিল, তার মধ্যে একটা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটু দূরে গলা ফুলিয়ে কিচিকিচি-কিচিমিচি কক্কে কক্কে ভ্যাব্-ভ্যাব-প্রিং প্রিং শব্দ করে ফুরুৎ উড়ে গিয়ে একটা পেয়ারা গাছের ডালে গিয়ে বসল।

মুনীশ্বর! মুনীশ্বর!

কর্তা মশায়ের ডাক শুনে মুনীশ্বর উত্তর দিলে—যাই কর্তা!

—যাই কর্তা কি! দেখতে পাচ্ছ না এরা যে খিদেয় ছট্‌ফট্ করছে। খাবার দাও নি কেন?

মুনীশ্বর কিছুক্ষণ আগেই তাদের খাবার ছড়িয়ে দিয়েছিল। কর্তা তখন লেখায় মগ্ন, দেখতে পান নি। মুনীশ্বর বললে, এদের পেট ভরে গেছে। এখন সব আনন্দে খেলা করছে।

ঋষি বললেন—তোমার মাথা। দেখছ না কি রকম ঝগড়া করছে সব! নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

মুনীশ্বর কর্তার ধাত খুব ভাল করে জানে। আর দ্বিরুক্তি না করে মুনীশ্বর আবার চারটি খাবার ছড়িয়ে দিয়ে গেল। কর্তা অনেক সময় এমন অনেক প্রশ্ন করতেন যার কোন অর্থ হত না, বোধ হয় শিশুরাও অমন প্রশ্ন করত না। মুনীশ্বর হাসি চেপে রেখে কাউকে বুঝিয়ে দিত ও বস্তুটি এই।

কর্তা বিজ্ঞের মত বলতেন—ঐ তো আমি যা বললাম তাই, তুই শুধু একটু ঘুরিয়ে বললি। জিনিষটা তো একই দাঁড়াল। বলেই অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে ফেললেন।

কিন্তু এই মধুর রসের সঙ্গে একদিন করুণ রসের সৃষ্টি হল। বলেছি তাঁর সর্বাঙ্গে বসে পাখিরা তাঁকে কতভাবে তাদের আদর ভালবাসা জানাত। তাঁর চোখের চশমার ফ্রেমটি ঠোঁটে করে তুলে ধরত কেউ কেউ। ঋষি হেসে আবার সেটা বসিয়ে দিতেন নাকে। স্বর্গীয় আনন্দ ঋষির চোখে মুখে।

একদিন একটা শালিক তাঁর চোখের চশমা নিয়ে ঐ রকম খেলা করতে করতে তার ঠোঁটের ঠোক্কর লাগিয়ে দিল তাঁর চোখের মণিতে! চোখ থেকে খানিকটা রক্ত ঝরে পড়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগল। ঋষি কুপিত হয়ে পাখিটাকে তাড়িয়ে দিলেন—যা যা দূর হ এখান থেকে।

পাখিটা এমন অনাদর আর কখনও পায় নি। বসল গিয়ে একটা আমলকীর ডালে।

ঋষির চোখে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হল। পাখিটি সারাক্ষণ চেয়ে রইল ঐ চোখের দিকে।

ঋষি কয়েকদিন ভুগলেন এই চোখের অসুখে। শালিকটা কোন-না-কোন গাছের ডালে বসে কর্তার চোখের দিকে চেয়ে থাকত। এ কয়দিন সে খাবার খেতে নামে নি এখানে। কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করত কে জানে! তবে মুনীশ্বর প্রায়ই দেখত তাকে গাছে গাছে উড়ে বেড়াতে।

কয়েকদিন পরে ঘা শুকিয়ে গেলে ঋষির চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হল। মুনীশ্বরের কাছে পাখিটার অনুতাপের কথা শুনে ঋষি করুণায় গলে গেলেন। বেচারার কি অপরাধ? সে কি বুঝতে পেরেছে চোখটা এমনিভাবে জখম হবে?

আয় আয়!—আদর করে ডাক দিলেন ঋষি পাখিটাকে।

কিন্তু সহজে আসতে চায় না পাখিটা কাছে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে উড়ে ঘাড়টা বাঁকা করে দেখে নেয় কর্তার চোখের ব্যাণ্ডেজটা সত্যিই আছে কি না। তারপর একবার সাহস করে উড়ে এসে বসে কর্তার পায়ের কাছে। কর্তা আদর

করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তুলে নেন তাঁর কোলে। তবু যেন ভরসা হয় না পাখির। বার বার কর্তার চোখের দিকে চায় তাঁর কাঁধে বসে।

মুনীশ্বরকে ডেকে বলেন কর্তা—আহা, বেচারি, অনেক দিন পেট ভরে খেতে পায় নি বোধ হয়, হয়ত উপোস করেই থাকত। দেখছিস না কেমন রোগা হয়ে গেছে! দে না কিছু খাবার এনে, খাক পেট ভরে।

খুঁটে খুঁটে খায় পাখিটা আনন্দে ঋষির দিকে চেয়ে কি একটা শব্দ করে মুখে।

ঋষির চোখে মুখে আনন্দের হিল্লোল! জীব-পশু-পাখি-গাছপালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান ঋষি। সব সৃষ্টির যিনি আদিভূত সেই বিরাটের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেন নিজের অন্তরাত্মায়। অনিন্দ্যসুন্দর বিমল হাসিটি ফুটে তাঁর ঠোঁটের দুকূলে জড়িয়ে থাকে।

... ...

আর একজন ঋষিকে চাক্ষুষ দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনের পরিবেশে নয়, দেবতাত্মা নগাধিরাজের বুকে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'দ্বারে আসি দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ'। তাই সেবার ছুটেছিলাম কবি-গুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁর শৈলাবাসে। কালিংপঙে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গৌরীপুর ভবনে অবস্থান করছিলেন তিনি তখন।

বিকালের দিকে উপস্থিত হলাম গৌরীপুর ভবনে। গিরিমাটির রঙের বাড়িখানা চিনতে কষ্ট হয় নি। দেখলাম নানাদিকের পথ ধরে অনেকে চলেছে ঐ গৌরীপুর ভবনের দিকেই। বুঝলাম ওরা আমাদেরই মত তীর্থযাত্রী—কারও বা হাতে পুষ্পস্তবক কারও বা হাতে পুষ্পমালা।

দোতলায় প্রশস্ত বারান্দায় একটি আরাম-কেদারায় কবি ছিলেন অর্ধশায়িত অবস্থায়। মাঝে মাঝে তাঁর একটা অদ্ভুত কাশির অত্যদ্ভুত আওয়াজ চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলছিল।

বাড়িটির সামনে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। লাল সাদা ও গেরুয়া রঙের ফুলগুলি বৈকালিক সূর্যের পড়ন্ত রোদের আভায় মনোহর হয়ে উঠেছিল। একটু আগেই আকাশের নানা স্থানে ঘন কালো মেঘের ইতস্ততঃ সঞ্চার দেখে ভীত হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নির্মল, নীল আকাশে হেলায়িত পর্বতমালার গায়ে সোনার রঙ ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল। স্বর্ণাভ সূর্যের এ ঐশ্বর্য কল্পনা করা যায় না।

কবির আরাম-কেদারার পাশে দেখলাম এটর্ণি হীরেন দত্তকে। কবির সঙ্গে কি একটা গভীর আলোচনা নিয়ে মগ্ন। এ সময় তাঁদের আলোচনায় বাধা দেওয়া ঠিক নয়। নীরবে কবির নবনীতকোমল রক্তাভ পা দুখানি স্পর্শ করে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে সরে গেলাম দূরে।

এই শৈলবাস থেকেই কবির জন্মদিনের বাণী প্রচার করা হবে বেতারবার্তায়। কলকাতা থেকে নৃপেন মজুমদার গিয়েছিলেন সব ব্যবস্থা করতে। ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।

'উহু' হ!'—সেই মারাত্মক কাশির আওয়াজ। বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে। আলো যতই পড়ে আসছে আওয়াজটা ততই শোনা যাচ্ছে। মুহুর্মুহু। ভাবলাম—সেরেছে রে, বুঝিবা সব পণ্ড হল আজ।

আধ ঘণ্টা তখনও হাতে আছে। কবি গিয়ে বসেছেন মাইক যন্ত্রটা যে ঘরে বসানো ছিল সেই ঘরে। সমস্ত ঘরখানায় যেন ফুলের মেলা বসেছে। এই পাহাড়ি দেশে এত ফুল ছিল কোথায়? জানা-অজানা ফুলের মধ্যে অগণিত শ্বেতপদ্ম—অর্ধমুদিত দল, আর অজস্র রজনীগন্ধা। ধূপ ও ফুলের মিলিত গন্ধ এক অপূর্ব আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

আর একবার প্রণাম করে দাঁড়ালাম। এবার যেন মন্দিরের ভিতরে এসে দেবতাকে প্রণাম!

একটু বাদেই কবির উদার কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

আজ মম জন্মদিন।
সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে
বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে·········

জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় সেদিন নৈঃশব্দ্যের মাঝে ধ্বনিত হতে লাগল একটি বাণী—সুদীর্ঘ, গম্ভীর, মহান। প্রতিধ্বনি তার বেজে উঠল পর্বতমালার প্রান্ত থেকে প্রান্তে বেজে উঠল সারা বাংলায় হয়ত বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আরও দূরে দূরান্তরে।

আশ্চর্য! এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কবির সেই মারাত্মক কাশিটার আওয়াজ তো একবারও শোনা গেল না! ধন্যবাদ দিলাম বিধাতাকে। কবির জন্মদিনের বাণী অম্লান!

কবি দেখেছেন মহাজীবনকে, দেখেছেন মহামরণকেও। এ দুয়ের মহামিলনকে ছাপিয়ে তিনি উঠেছেন আরও ঊর্ধ্বে—যেখানে জ্যোতিষ্মানের আলোয় সব হয়েছে জ্যোতির্ময়!

কবির সেক্রেটারি অনিল চন্দকে জিজ্ঞেস করলাম—হীরেন দত্তের সঙ্গে কিসের আলোচনা হচ্ছিল কবির?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনিল চন্দ বললেন—তাঁর সঙ্গে গুরুদেব মহাভারত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। গুরুদেবের মাথায় এখন মহাভারত ভর করেছে। এই বিরাট কাব্যগ্রন্থের ভাষ্য তিনি করে যেতে চান। তাঁর ভাষ্যও হবে বিরাট। বিরাটত্বের মহিমাকে প্রকাশ করার জন্যে তাই তিনি বিরাট হিমালয়ের আশ্রয় নিয়ে আত্মস্থ হতে চান। বারান্দায় এসে সমুখের ঐ অভ্রভেদী চূড়ার দিকে চেয়ে প্রায়ই তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন।

ভুরি ভোজনের আয়োজন হয়েছিল অতিথিদের জন্যে। প্রতিমা দেবী স্বয়ং পরিবেষণ করেছিলেন।

রাত বোধ করি এগারোটা হবে। অনিল চন্দের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম অন্যত্র। একটা পাইন বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলেছে। সারা বনে চন্দ্রালোকের আবছা রূপ স্নিগ্ধ কোমল।

যে মহাপুরুষ আজ আমার সামনে উদ্ঘাটিত হলেন তাকে এর আগে তো আর এমন করে পাই নি। আমার মন, প্রাণ ও চিত্ত আজ তাঁরই চিন্তায় আচ্ছন্ন।

সেদিন রাতে চোখের পাতায় আমার ঘুম নামে নি! দৃষ্টিটা ছিল অন্তর্মুখী, তাই।

সেদিন আমার অন্তর্লোকে যে মহাকবিকে দেখেছি তিনি চলেছেন বলিদ্বীপের এক রাজার রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হয়ে। রাজা ও তিনি একই সঙ্গে এক মোটরে চলেছেন। সুদীর্ঘ পথ। রবীন্দ্রনাথের মস্ত সুবিধা এই যে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কেউ কারও ভাষা জানেন না। তাই তিনি বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য পান করার অখণ্ড অবাধ অবসর পেলেন। পথের দুধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর ছায়া বেষ্টিত লোকালয় দেখতে দেখতে তাঁর প্রাণ পরম পুলকে আচ্ছন্ন হয়ে এল। এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁক দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা যায় সেইখানে রাজা বলে উঠলেন 'সমুদ্র' রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। আরে, রাজা যে তাঁরই ভাষায় কথা কয়। রাজ-অতিথির বিস্ময় ও আনন্দের ভাব দেখে রাজা আউড়ে গেলেন—'সমুদ্র' সাগর, অব্ধি জলাঢ্য।' তারপরে বললেন—

'সপ্তসমুদ্র সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্ত আকাশ।' তারপরে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—'অগ্নি সুমেরু হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয় ঋষ্যমূক।' এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোট নদী বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়ে গেলেন—গঙ্গা যমুনা নর্মদা, গোদাবরী কাবেরী সরস্বতী।

মহাকবি অবাক বিস্ময়ে মুহূর্তের মধ্যে ভারতবর্ষের বৃহত্তর সত্তার আন্তর মহিমা উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল, তখন সে আপনার নদী-পর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে—দক্ষিণে কন্যাকুমারী উত্তরে মানস সরোবর, পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব সমুদ্রে সূর্য মন্দির—যাতে করে তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের ভূগোলে জানা তো নয়, তার নানা জাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্য সাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল।

মহাকবি বললেন—সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্ব মহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে আজ হাজার হাজার বছর পরেও সেই-ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল, এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে করে। সেদিনকার ভারতবর্ষ যে আপনার ঐক্যটিকে কত বড় আগ্রহের সঙ্গে জেনেছিল, আর সেই সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে—সে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গেছে।

ভারত মহিমায় মহিমান্বিত, উপলব্ধ সত্যের প্রভায় প্রোজ্জ্বল-চিত্র এ রবীন্দ্রনাথকে কয়জন দেখেছে?

আজ তন্দ্রা নিশীথে বিরাট হিমালয়ের ক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় আমার অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত হল সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি ধ্যানী, যিনি জ্ঞানী, যিনি কর্মী। যিনি প্রাচীন ভারতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তার স্ব-সত্তায়—যিনি চাইছেন মহাভারতকে মহাবিশ্বে সম্প্রসারিত করতে।

১৫

বৈঠক-আড্ডারও যে একটা দাম আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাই কত সাহিত্যিক-শিল্পী-কবি-নাট্যকার ইত্যাদি আড্ডাখানার ভিতর দিয়েই স্ফুরিত হয়ে উঠেছেন।

বঙ্কিম-দীনবন্ধুকে চোখে দেখি নি কিন্তু তাঁদের আমলের কথাও তো কানে আসে। তারপর রবিঠাকুর-দ্বিজু রায়ের, সমাজপতি-পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যের, 'মানসী ও মর্মবাণী'র, 'ভারতী'-র এবং 'সবুজ পত্র'-এর দলের কথাও অনেকেই শুনেছেন।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'রবিবাসর'-এর বেশ একটু নাম ছিল। এই সময়ে আমাদের 'বারবেলা বৈঠক' আর সজনী দাসের 'শনিচক্র' (নামটা আমাদের দেওয়া) বিশেষ করে সাহিত্যিকদের জমাট আড্ডার ক্ষেত্র ছিল। শনিবারের চিঠির পাতা খুললে দুদলের চোখা চোখা বাণ মারামারি চোখে পড়বে। এ ছাড়া কলকাতায় তখন আরও কয়েকটা বৈঠক বসত যাদের কৌলীন্য ছিল। তাদের মধ্যে দুটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পরিচিত—একটি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের গজেন ঘোষের বৈঠক আর অপরটি হল কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্র।'

গজেন বাবুর বৈঠকখানাটি ছিল অভিজাত শ্রেণীর। সুদীর্ঘ এবং প্রশস্ত হল ঘরটিতে বহুলোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। এখানে বহু জ্ঞানী গুণী ছাড়াও ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরও সমাগম হত। বয়সে নবীন আমরা সেদিকে পা বাড়াবার সাহস করতাম না।

'রসচক্র'-এর প্রতিমাটি কবিশেখরের ভাই রাধেশ রায়ের হাতে গড়া, কিন্তু তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং কবিশেখর—আমাদের কালিদা। এখানে হত নবীন-প্রবীণদের অবাধ সংমিশ্রণ, বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ কোন তারতম্য ছিল না। রসপিপাসুদের কাছেই রসচক্রের আকর্ষণ ছিল তীব্র। গোড়ার দিকে বসন্ত রায় রোডে কালিদার তখনকার আবাসে বৈঠক বসত। তারপর বিখ্যাত শিল্পী সতীশ সিংহের যতীন দাস রোডের বাড়িতেই রসচক্রীরা চক্রাকারে বসে যেতেন। শিল্পীর পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ দেখেছি এখানে-ওখানে দেওয়ালের গায়ে বা উপরে উঠে যাবার সিঁড়ির ধারে ধারে। শিল্পীর নিজেরই আঁকা ছবি সব। চক্রের প্রবেশপথেই মনটা তৈরি হয়ে যেত। বৈঠক বসত প্রতি রবিবারে। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র এবং সংস্কৃত কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ড. সুরেন দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে এখানে পদধূলি দিতেন।

আকাশে যেমন তারা ছটকে পড়ে তেমনি রসচক্রের কেউ কেউ ছটকে পড়তেন আমাদের আসরে; আমাদেরও গতি ছিল রসচক্রে অমনি ধারা। সাহিত্য-শিল্পকলার আলোচনা যে মুখ্য ছিল তা নয়, যা আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল তা হচ্ছে হৃদ্যতা। প্রথমটি বুদ্ধির জিনিস, দ্বিতীয়টি হৃদয়ের। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগ হলে যে মধুর রস সৃষ্ট হয় তা থেকেই তো আনন্দের জন্ম, আর এই আনন্দ থেকেই তো নব নব সৃষ্টি সম্ভব। আমাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাটা ছিল একটা রীতিমত আর্ট এবং এ আর্টে আমাদের বৈঠকে দুজন ওস্তাদ ছিল—এক প্রেমেন্দ্র মিত্র, অপরটি সরোজ রায় চৌধুরী। প্রেমেন তার চশমার উপর দিয়ে কুৎকুৎ করে চেয়ে কখন যে কাকে পিঁপড়ের মত কুটুস করে কামড়ে দেবে তার ইয়ত্তা ছিল না; আর সরোজ রায় চৌধুরী ছোট্ট তিনটি চারটি শব্দে গম্ভীর ভাবে এমন মোক্ষম চাল চেলে দিত যে, আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। বলা বাহুল্য, এদের বিদ্রূপের বাণ গায়ে লাগলেও ব্যথিত হই নি কখনও বরং উপভোগই করেছি।

ওদিকে রসচক্রের বিশুদার মত অমন প্রাণবন্ত, অনাবিল রসোল্লাসে উচ্ছল মানুষ খুবই কম দেখেছি। রসের ভিয়েনে যেন সব সময়ই টগবগ করে ফুটতেন তিনি। একবার একদিন ফুটবল খেলার মাঠে তাঁর কীর্তির কথা মনে আছে। ফুটবল খেলা দেখবার জন্যে পাগল হতেন তিনি নজরুল আর প্রেমেনের মত। একদিন গেছি তাঁর সঙ্গে ফুটবল খেলার মাঠে, সেদিন প্রেমেনও ছিল, আর ছিল প্রবোধ সান্যাল। আমরা সব গ্যালারির খদ্দের। অতিকষ্টে টিকিট যোগাড় করে দুরন্ত ভিড় ঠেলে গেটের কাছাকাছি গেছি এমন সময় অশ্বারোহী পুলিশের নিয়ন্ত্রণী ঘোড়ার মুখটা ঘাড় ছুঁয়ে গেল। শেষপর্যন্ত ভিতরে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খেলা শুরু হবার তখন আধ ঘণ্টা দেরি। একটু আগেই চড়া রোদ ছিল। হঠাৎ কালো মেঘের সঞ্চার দেখা গেল আকাশে। খেলার মাঠে খুব কমই আসতাম আমি। আশঙ্কা হল খেলা দেখার শখ বোধ হয় এইবার ভাল করেই মিটবে। বিশুদার ভ্রূক্ষেপ নেই। মুষলধারে বৃষ্টিই নামুক কিংবা বজ্রপাতই হক, মাঠ ছেড়ে তিনি কোথাও নড়বেন না। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল বড় বড় ফোঁটা। মাথায় যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। মজা এই, আকাশে একদিকে ঘনঘটা, আবার একখানা বড় মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেবও উঁকি মারছেন! আমাদের নিয়ে যেন ইয়ার্কি চলছে তার, রুমালটা মাথায় বাঁধলাম, কিন্তু তাতে কি হবে? তারপর কোঁচার কাপড়টি খুলে তার উপর জড়িয়ে

ভিজায়। যারা সঙ্গে ছাতা এনেছিল তারা ছাতা খুলতেই হৈ-হৈ চীৎকার! ছাতার জল গড়িয়ে যে গায়ে পড়লে আরও বিপদ! কেউবা গ্যালারির পাটাতনের তলায় মাথা গুঁজবার চেষ্টা করল। সে আরও হাস্যকর ব্যাপার। বিশুদার এদিকে মুখ আলগা হয়ে গেছে। এই দুর্ভোগের তো অন্ত চাই। হাসির চব্বরা চলেছে আমাদের মধ্যে। বৃষ্টির ধরন দেখে মনে হচ্ছিল এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না। হলও তাই। হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গেল।

বিশুদা একটু এদিক ওদিক চেয়েই যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমার গা টিপে চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—এই, সরে পড়, সরে পড় এখান থেকে। চল ওদিকটায় একটু এগিয়ে যাই।

কেন, কি হল বিশুদা?

মুখ ভেঙচে তিনি বললেন—কি হল বিশুদা! চল শীগ্‌গীর বলছি, পা চালা। কেন, তা বলছি ওদিকে গিয়ে।

বেশ তো ছিলাম বিশুদা। আবার এমন সুবিধা মত জায়গা কি মিলবে?

না মেলে না মিলবে। আরে, ঠিক আমার পিছনেই যে দাঁড়িয়েছিল আমার দুটি ছাত্র। ওরা এম. এ. পড়ে। কি লজ্জা বলত ভাই! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কত বেফাঁস কথাই না বলে ফেলেছি। ওরা কি ভাববে বলত ভাই!

ভাববে ঘোড়ার ডিম। ওদেরও তো বয়েস হয়েছে বিশুদা। শিক্ষক-ছাত্রে বয়েসের যে খুব বেশি তফাৎ তা তো মনে হয় না। তাদের শিক্ষক যে একজন পাকা রসিক লোক তার প্রমাণ পেয়ে তারা খুশিই হয়ে যাবে।

যাঃ!—বলে বিশুদা চুপ করে গেলেন। বিশুদা ঐ সময় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক। পুরো নাম বিশ্বপতি চৌধুরী।

রসচক্রের আর দুজন সভ্যকে দেখে বড় আনন্দ হত। গজেন্দ্র মিত্র আর সুমথ ঘোষ আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বয়সে নবীন হলেও আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এঁরা ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। এঁদের উভয়ের সম্পর্কটা বেশ মধুর লাগত। যেখানেই দেখা হক না কেন, উভয়কেই দেখতাম একসঙ্গে। দুই যেন এক হয়ে গিয়েছিল—একজনকে অপরের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারতাম না। আমরা বলতাম মাণিকজোড়। সেই যে জীবনের প্রথম বসন্তে এঁরা জোড় বেঁধেছিলেন সে জোড় আজও খোলে নি, তেমনি অটুট আছে।

এবার ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথাটা শুরু করি। এ ভূমিকাটুকুর এখানে প্রয়োজন আছে বলেই করলাম।

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। তিথি বোধ হয় শুক্লা চতুর্দশী। যে কোন রসিক জনের আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে এতে রসোচ্ছ্বাসের কথা। পাঁচটার পর থেকেই সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসর বসেছিল। কাশী থেকে আমাদের এক বন্ধু এসেছিলেন। বেশ মিষ্টি গলা তাঁর, রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভালই গাইতেন। প্রথমেই মিহিগলায় শুরু করলেন—

না, না গো না,
করো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না॥
যখনি চলে যাই আসিব ব'লে যাই,
আলোছায়ার পথে করি আনাগোনা॥

... ...

গানখানি শেষ হবার পর বেশ একটু আমেজ এসেছে লক্ষ্য করে বন্ধুবর ধরলেন আর একখানি—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না॥
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা॥

... ...

সুন্দর আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। সুরের অপূর্ব মূর্ছনায় কাব্যরসের নির্ঝর বয়ছিল। সুরের দোলায় আমরাও যেন দোল খাচ্ছিলাম এমন সময় দরজার সামনে এসে 'ছোঃ' বলে দাঁড়িয়ে গেল কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তখনও জড়িয়েছিল তার মুখে গানের একটুখানি রেশ—

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছ্‌লে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥

একটু জোছনা ফুটলেই বিজয়লালের কণ্ঠে ফুটত ঐ গানখানি। গানের জন্যে সাধনা করে নি বিজয়লাল কোনদিন। আমাদের মত আর পাঁচজন আনাড়ির যেমন ভাবের প্রকাশ হয় গানে বিজয়দারও তেমনই হত, কিন্তু তারই মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—সুরের হুবহু অনুকরণের ভুল হত না তার। অনেক

দিন চারিদিনি রাতে অফিস থেকে ফেরবার পথে তার মুখে এই গানখানি শুনে আনন্দ পেয়েছি।

'ছোঃ' শব্দটি ছিল বিজয়দার হৃদয়ের আনন্দের প্রকাশ। আবার যদি কখনও কোন আলোচনার মধ্যে আদিরসের কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটাও থাকত তবে তখনও ফুটত তার মুখে ঐ 'ছোঃ' শব্দটি। বিজয়দা তখন ব্রীড়াবনতা কুমারী কন্যার মত অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এক হাতে মুখটা ঢেকে মাটির দিকে চেয়ে থাকত।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আদর্শের অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল বিজয়দার চরিত্রে। শান্তিনিকেতনে ছিল তো কিছুকাল, পরে আমাদের পত্রিকায় যোগদান করার পর বছর তিনেক বাদে ছুটল গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

এদিনকার আসরে উপস্থিত ছিল আমাদের সহকর্মী শচীন্দ্রলাল ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের যে সব গানে ভারি উদাত্ত কণ্ঠের প্রয়োজন শচীন সেখানে প্রায় অদ্বিতীয় ছিল। তার মুখে যে গানখানি শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতাম আমার অনুরোধে সে সেইখানি ধরল—

বাজো রে বাঁশরি, বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।
বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে—
মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটে নি কি আজও?
রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীরঝঙ্কৃত পায়ে সৌরভমন্থর বায়ে
বন্দনসঙ্গীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো॥

আমাদের এই মাটির পৃথিবী অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। এখানে বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে বেলা-চামেলি-রজনীগন্ধার আকুল-করা সৌরভ; ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে; ফাল্গুনের নবস্পর্শে দিকে দিকে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ-কোমল সবুজের আভা; বনে বনে পাখিদের কলরবের সঙ্গে মিশে যায় বন-বীথিকায় ঝরা পাতার মধুর মর্মরধ্বনি; আষাঢ়ের আকাশ ছেয়ে আসে বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘের পুঞ্জ। মহাকবি গেয়েছেন প্রকৃতির এই বিচিত্র সৌন্দর্যের গান। মানুষের হৃদয়ে প্রকৃতির লীলা-বৈভব ঢেউ খেলে যায়। রবীন্দ্রনাথেরই সৌন্দর্যানুভূতির অনুরণন ওঠে আমাদের মর্মে মর্মে।

এই মাটির মায়া ছাড়িয়েও কিন্তু মহাকবি উঠে গেছেন ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশে

এবং আমাদেরও নিয়ে গেছেন সেখানে। সেখানকারই উদাত্তধ্বনি এবার বাজল শচীনের কণ্ঠে—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে॥
অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন—
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরণ, কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দ রে
বিহগগীত গগন ছায়— জলদ গায়, জলধি গায়—
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান—
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে॥

গায়কের হাতে না ছিল তানপুরা, না ছিল কোন পাখোয়াজের গুরু-গম্ভীর ধ্বনির সঙ্গত। শুধু হারমোনিয়ামের সুর ও তবলার আওয়াজের সঙ্গে শচীনের কণ্ঠ মিলে যে ধ্রুপদের তান সৃষ্টি করতে পারে গায়ক তারই চেষ্টা করেছিল। আমরা যেন উঠে গেলাম মহাব্যোমে, যেখানে বিরাজ করছে নিথর শান্তি-নিশ্চল নীরবতা! হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেছে, কানে বাজছে যেন লীলাময়ের সৃষ্টি-লীলায় সেই আদিম ওঙ্কার-ধ্বনি!

খেয়াল ছিল না কোন দিকে। হঠাৎ মোহ ভাঙলে দেখি নন্দগোপাল বসে আছে এক কোণে।

আরে, নন্দ যে। কি ব্যাপার? এদিকে কি আজ ভুলে পা বাড়িয়েছ?

ভুল ঠিক নয়। কিছু একটা হাতে নিয়ে এসেছি এই আসরের জন্যে। সেও এক রসের ব্যাপার। তবে এখানে গাঢ় রসের যে ভিয়েন দেখছি তাতে এই তরল রসের পরিবেষণে মন সরছে না।

অত ভূমিকা করার প্রয়োজন নেই, ভাই। আমরা সব রসই সমানে চেখে থাকি, মিষ্টি হলে।

নন্দর মুখে যে কাহিনী শুনলাম তা শরৎচন্দ্রের নিজেরই বলা কাহিনী, রসচক্রের আসরে। শরৎচন্দ্র ছিলেন রসিকতায় একজন পাকা ওস্তাদ। অপরকে নিয়ে তিনি অনেক রসিকতা করেছেন কিন্তু নিজেকেও যে তিনি রেহাই দেন নি, এ কাহিনী তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রসচক্রে যে দিন তিনি নিজেকে নিয়ে

এই রসিকতা করেন তার কয়েক দিন আগেই একটা অধিবেশনে প্রসিদ্ধ দার্শনিক সংস্কৃত কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন।

ড. দাশগুপ্ত শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের এমন অপূর্ব বিশ্লেষণ সেদিন করলেন যা শুনলে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। সাহিত্যের রসবিচারে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, মনোবিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বোদ্‌ঘাটন এবং সেই সঙ্গে চারিত্রিক সঙ্গতির অমন সূক্ষ্ম বিচার বড় বেশি শুনতে পাওয়া যায় নি। বলা বাহুল্য, এ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না, কারণ তাঁরই সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে এটা একটি বিশেষ অধিবেশন।

একদিন শরৎচন্দ্র তাঁর পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়ি থেকে শিল্পী সতীশ সিংহের যতীন দাস রোডের বাড়িতে আসছিলেন। পথে এক জায়গায় একটা দারুণ হট্টগোলের আওয়াজ আসছিল কানে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল একটা তুমুল কাণ্ড—ঝগড়া, গালাগালি, মারামারি। চারিদিক থেকে লোকের ভিড় জমে গিয়েছিল। একটা অল্প বয়স বালককে নিয়ে এই কাণ্ড। একটি পুরুষ ঐ বালকটিকে ধরে নৃশংসভাবে প্রহার দিচ্ছিল, আর একটি নারী ছেলেটিকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিল। ছেলেটির পরিত্রাহি ক্রন্দনধ্বনি মর্মান্তিক। উপস্থিত অনেকেই ব্যথিত হলেন। আহা, অমন কচি ছেলে, কি এমন করেছে যার জন্যে তার এই নির্মম শাস্তি। কেউ কেউ পুরুষটাকে ধমক দিয়ে ব্যাপারটা কি তাই জানতে চাইলেন। কিন্তু পুরুষটি কঠোর, কঠিন। এদিকে নারীটিরও ক্রোধের মাত্রা চরমে উঠেছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের গালিবর্ষণ তখন সাগিনি মতে অশুদ্ধ।

শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে গেলেন। আরে, ঐ পুরুষ ও নারী উভয়েই যে শরৎচন্দ্রের চেনা। রাস্তার ধারে ঐ ছোট হোটেলটাতে পুরুষটি পাচকের কাজ করে আর নারীটি ঐ হোটেলের ঝি। ওদের দুজনের মধ্যে মনের সম্পর্ক ছিল এবং সেই মনের সম্পর্কেরই ফল ঐ বালকটি।

ছেলেটাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার দেওয়ার হেতু কি তাই জানবার জন্যে শরৎচন্দ্র উৎসুক হয়েছিলেন।

নারীটি শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রের দিকে একবার চাইতেই শরৎচন্দ্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে, হ্যাগা?

হবে আবার কি? ঐ বিত্তেহিন্‌ গজের ছেলে ইস্কুলে পড়া পারে নি তাই।

তা-ও আবার ইন্‌জিরি লেখাপড়া, মাস্টাররা প্রায়ই বলে, এবার নাকি বলেছে ইস্কুল থেকে ছেলেটার নাম কাটিয়ে দেবে। তাই ঐ মিন্‌সের এত রাগ। ছেলেটাকে একেবারে মেরে ফেললে গো।

ছেলেটাকে টেনে এনে তার পিঠে পাঁচটা আঙুলের দাগ শরৎচন্দ্রকে দেখিয়ে দিল নারীটি।

পুরুষটার দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—পড়াশুনা কি দু-একদিনেই হয় বাপু? তার জন্যে সময় দরকার। অমন করে মারলে কি তার পড়ায় মন বসবে? বুঝিয়ে সুঝিয়ে আদর করে তার পড়ায় মন বসিয়ে দিতে পারলে দেখবে ছেলের পড়ায় নেশা আপনি আসবে।

নারীটি বললে—আমিও তাই বলি ঐ মুখপড়া মিন্‌সেকে। তা আমার কথা কানেই তোলে না। কথায়-কথায় কেবলই ছেলের গায়ে হাত! মিন্‌সে যেন দস্যি গো। পড়া পারে না, তাও আবার ইন্‌জিরি পড়া। বলি কি মিন্‌সেকে যে, ইন্‌জিরি লেখা-পড়া শিখে কি তোমার ছেলে দারোগাপুলিশ হবে, না, জজ ম্যাজিস্টার হবে? সে কপাল কি করে এসেছ? তা হলে এই হোটেলের রাঁধুনি বামুন হতে না। বাঙালির ছেলে, বাংলাই শিখুক না ভাল করে।

কি মনে হল, ক্রন্দনরত ছেলেটিকে নিজের কোলের কাছে টেনে এনে তার গালে কষে একটি চপেটাঘাত করে নারীটি বললে—কাজ নেই বাপু, তোর ইন্‌জিরি শিখে। তুই মন দিয়ে বাংলাই পড় গে যা।

শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে একটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নারীটি বললে—আচ্ছা, তুমিই বল না, দাদাঠাকুর। বাংলা ভাল করে শিখে নিলে আর কিছু পারুক আর নাই পারুক, তোমার মত দুখানা বই লিখেও তো খেতে পারবে?

তা যা বলেছ।—বলে হেসে শরৎচন্দ্র সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

১৬

আমাদের বৈঠকে কথায় কথায় একদিন বেগম সমরুর প্রসঙ্গ উঠল। বেগম সমরু ছিলেন অসামান্য সুন্দরী মহিলা, যিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় তাঁর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন, বীরত্বব্যঞ্জক দুর্জয় সাহস, বুদ্ধির প্রাখর্যে দীপ্ত কার্যকলাপ, রাজনীতিতে চাণক্যসুলভ ছলাকলা যাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। তাঁর সমগ্র জীবনটাই যেন একখানা রীতিমত নাটক এবং সে

নাটকের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল দূরদূরান্তে, যখন মুঘল সাম্রাজ্যের চরম অধঃপতন দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

একজন বললেন—হাঁ, ইতিহাসে বেগম সমরুর নাম পেয়েছি এবং তাঁর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। তবে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু জানি না।

আমাদের মধ্যে যে বন্ধুটি যুক্তপ্রদেশের বহু অঞ্চল ঘুরে সবে কলকাতায় ফিরেছেন, তিনিই শুরু করলেন বেগম সমরু-প্রসঙ্গে বলতে—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। দিল্লীর মসনদে তখন দ্বিতীয় শাহ আলম সমাসীন। ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দেশের চরম দুরবস্থা। কোন রাজ্য ধ্বসে পড়ছে, আবার অন্যদিকে গজিয়ে উঠছে আর এক নতুন রাজ্য। বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার যেন অন্ত নেই। সুযোগ পেয়ে বিদেশীরা দলে দলে ঢুকে পড়েছে এই দেশে আর যে যেখানে পারে লুঠতরাজ করে ভারতের ধনদৌলত নিয়ে সরে পড়ছে নিজেদের দেশে। দুঃসাহসী যারা তারা এদেশেই শিকড় গেড়ে এক একটা সৈন্যদল সৃষ্টি করে তার অধিনায়ক হয়ে কোন রাজ্য আক্রমণ করছে কিংবা কোন রাজ্যের বেতনভুক হয়ে সেই রাজ্যের পক্ষে লড়াই করেছে অপরের বিরুদ্ধে।

দুর্বল ভীরু চরিত্রহীন সম্রাট শাহ আলম। কোন প্রতিকার করার সামর্থ্য তাঁর নেই। কোন বেপরোয়া লোক যদি উড়ে এসে জুড়ে বসে সম্রাটকে কোনরূপে বন্দী করতে পারে তবে তার পোয়া বারো। সম্রাটের ভীতি উৎপাদন করে তাঁর কাছ থেকে যে কোন সনদ আদায় করে নিয়ে তার পক্ষে যথেচ্ছাচার করার কোন বাধাই নেই। ঠিক সেই সময়ে এক অসম সাহসী জার্মান এসেছিল এদেশে। তার নাম যাই হোক, এদেশে সে পরিচিত হয়েছিল সম্বার বা 'সমরু' নামে।

আমেদ শাহ আবদালির হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সম্রাট শাহ আলম তখন মারাঠিদের পক্ষপুটে থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করছিলেন—নামে মাত্রই সম্রাট, একটা রাবার-স্ট্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭৬৫ সাল। সমরু তখন ভরতপুরের রাজা জবাহর সিং-এর সৈন্য বিভাগে। ঐ রাজার পক্ষ থেকে সেনানায়ক হয়ে এসে সে যখন দিল্লী অবরোধ করে সেই সময় এক লাবণ্যময়ী, অনিন্দ্যসুন্দরী পঞ্চদশী দাসী-কন্যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সমরু এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে একে কিনে নেয় নিজের জীবন-

সঙ্গিনী করবার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘাঙ্গী নয়, কিন্তু নাতিক্ষীণাঙ্গী এবং তার রূপের বর্ণনা বোধ হয় কল্পনার পরীরাজ্যেই সম্ভব।

দাসী-কন্যা হলেও কেউ কেউ বলে এই তরুণী ছিল কাশ্মীরি নর্তকী, নৃত্যকলাই তার ছিল উপজীবিকার উপায়, আবার কারও কারও মতে সে আরব দেশের কোন অভিজাত বংশের কন্যা। দ্বিতীয় মতটা বোধ হয় তার উত্তরকালের স্ফুরিত প্রতিভার ফল।

সে যাই হক, এই তরুণী অতঃপর এল তার ক্রেতা মালিকের সঙ্গে তার হারেমে। কিন্তু এই স্বল্পপরিসর হারেমের এমন শক্তি ছিল না যা এই প্রতিভাময়ীর প্রতিভাকে ধরে রাখতে পারে। অল্প দিনের মধ্যেই সৈনিক সমরুর সমস্ত ভালবাসা নিংড়ে নিয়ে সে সর্বপ্রধানা হয়ে উঠল। অন্তঃপুরের বাধা ভেঙে ফেলে সে বেরিয়ে এল বহির্জগতে। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে সে সমরুর পার্শ্ববর্তিনী হয়ে সমর পরিচালনায় উৎসাহ দিয়েছে; সমরবিদ্যা চাক্ষুষ দেখে অভিজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সমরুর সৈন্যদলও এই প্রদীপ্ত-যৌবনার অনুরক্ত হয়ে উঠল। যুদ্ধে তাদের প্রেরণা তারা এই নারীরই কাছ থেকে যেন পায়।

ভরতপুরের রাজা যখন পরাজিত হলেন মারাঠিদের কাছে, তখন সমরু তার মনিবকে ত্যাগ করে সম্রাটের সৈন্যদলে যোগ দিল। সম্রাট সমরুর কাজে এতই প্রীত হলেন যে, তিনি সমরুকে এক বিরাট ভূখণ্ড—আলিগড় থেকে মুজাফরনগর পর্যন্ত—জায়গির হিসাবে দান করে দিলেন। সমরুর জায়গিরের রাজধানী বসল সারধানায়। এইবার এই প্রতিভাময়ী সুন্দরীর প্রতিভা বিকাশের সত্যিকারের সুযোগ এসেছে। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে বসে এইবার দেখাবে এই নারী তার নট-লীলা।

সমরু কিন্তু তার রণক্লান্ত জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিল, নতুন কোন দুঃসাহসের কাজে আর সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না। এবার সে চায় তার পরমা প্রিয়তমার বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে নির্বিঘ্নে শান্তি উপভোগ করতে। কিন্তু এ প্রিয়তমা তো তার সহধর্মিণী নয়, সহচরী, আনন্দদায়িনী মাত্র। সমরু ছিল খ্রীস্টানধর্মী রোমান ক্যাথলিক। সমরুর সহচরী এই রমণী সমরুকে পরম সুখে রেখেছিল, সমরুর হৃদয়রাজ্যে তার ছিল রানির আসন। ধীরে ধীরে জায়গির পরিচালনের সমস্ত ভার পড়ল এই সহচরীর ওপর। সমগ্র সৈন্যদলের আনুগত্যও লাভ করল এই রমণী।

১৭৭৮ সালে সমরুর মৃত্যু ঘটল। তার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল উন্মাদিনী আর

তার পুত্র জাফরও ছিল অপদার্থ। বিরাট জায়গির আর চার হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীতে ছিল বিয়াল্লিশ জন ইউরোপীয় অফিসার। সম্রাট শাহ আলম সরকারিভাবে সমরুর এই বেগমকেই বসালেন তাঁর প্রদত্ত জায়গিরের অধিকর্ত্রীরূপে। দাসী রমণী এবার সত্যিকারের রাজরানি।

কিন্তু বেগম তো জানেন কোথায় তাঁর দুর্বলতা। তাঁর সামাজিক মর্যাদা কোথায়? কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হলে তো এ মর্যাদা আসতে পারে না। তাঁর সেনাবাহিনীর ইউরোপীয় অফিসারগণ ছিলেন খ্রীস্টধর্মী রোমান ক্যাথলিক। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁদেরই ধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক হলেন। ১৭৮১ সালে তিনি আগ্রার রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় তাঁর সপত্নী-পুত্র জাফরসহ খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করলেন।

এইবার বেগম সমরু হয়ে উঠলেন প্রকৃত ক্ষমতাশালিনী। তাঁর সৈন্যবাহিনীর অমিতবিক্রম আর ক্যাথলিক গীর্জার পূর্ণ সমর্থন ও মর্যাদা দান তাঁকে একটি গৌরবোজ্জ্বল আসনে বসিয়ে দিলে।

সম্রাটের সামন্তরাজাদের মধ্যে মহিজি সিন্ধিয়া ছিলেন সর্বপ্রধান। প্রকৃতপক্ষে তিনিই যেন সম্রাট—সমগ্র উত্তর ভারতের তিনিই তখন কর্তা। এই সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিরূপে বেগম সমরু কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বস্তুত সর্বত্রই ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এবার তিনি রাজনীতি নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাতে শুরু করলেন এবং দিল্লীর দিকে নজর দিলেন।

একবার সিন্ধিয়া যখন দক্ষিণাচলে সেই সুযোগে সাহারাণপুরের রোহিলা-সামন্ত গোলাম কাদির যমুনা পেরিয়ে এলেন সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে এবং অকস্মাৎ সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিলেন সিন্ধিয়ার স্থলে গোলাম কাদিরই 'আমির-উল্-উমর'। এদিকে বেগম সমরু তাঁর সৈন্যদল নিয়ে হাজির হলেন দিল্লীতে। সম্রাটের অপমান তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। বেগতিক দেখে গোলাম কাদির এক চাল চাললেন। তিনি বেগমের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নি সম্পর্কের প্রস্তাব করে এক সঙ্গে এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করবেন বললেন। ভগ্নী বললেন—তথাস্তু, কিন্তু আজ নয়, কাল। ভ্রাতা এই আশ্বাস পেয়ে তাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন সেই রাত্রের মত। দিল্লীর রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ দখলে এনে বেগম সম্রাটকে অভয় দিয়ে বললেন তিনি সম্রাটের জীবন রক্ষা করবেনই, তাতে তাঁর নিজের জীবন যদি যায় তো যাক। রাতারাতি বেগম তাঁর সেনাদলের ব্যূহ রচনা করে প্রাসাদ রক্ষা করতে লাগলেন। পরদিন

গোলাম কাদির যখন দেখলেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বেয়াকুব বানিয়ে ঠকিয়েছে, তখন তিনি তাঁর শিবির থেকে সম্রাটের কাছে এই দাবি পেশ করলেন যে, বেগমকে যেন অবিলম্বে রাজপ্রাসাদ থেকে দূর করে দেওয়া হয়। সম্রাট এ দাবি অগ্রাহ্য করলেন। গোলাম কাদির পরাজয় স্বীকার করে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। সম্রাট বেগম সমরুর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে উপাধি দিলেন 'জেব-উ-নিসা' অর্থাৎ 'নারীরত্ন'।

কুলি খাঁ নামে স্থানীয় এক ভুঁইফোঁড় সর্দার সম্রাটের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করে বসল। সম্রাটকে সম্মুখ সময়ে আহ্বান করে সে বললে, 'আর এনো বেগম সমরুকে তোমার পাশাপাশি'। কিন্তু হঠাৎ গোকুলগড়ে কুলি খাঁর সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করলে রাজকীয় সেনাবাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সম্রাটের জীবন তখন বিপন্ন। আর অপেক্ষা নয়, বেগম তাঁর নিজেরই আবাসে সম্রাটকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে বলে ছুটে গেলেন যেখানে সম্রাটের সৈন্যদলে ভাঙন ধরেছিল। পাল্কি থেকে নেমে তাঁর দুর্ধর্ষ সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে আদেশ দিলেন—'চালাও গুলি, গুলি চালাও।' কুলি খাঁর দর্প খর্ব হল। তাঁর সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেল না।

সম্রাট যেটুকু পারেন তাই করলেন। অর্থাৎ তিনি অতঃপর এক দরবার বসিয়ে বেগমকে তাঁর 'পরমা প্রিয়তমা কন্যা' বলে ডেকে এক গালভরা উপাধি দান করলেন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জার একবার শখ হল তিনি পিতৃসম্পত্তি সব উদ্ধার করবেন এবং এ জন্যে তাঁর চাই বেগম সমরুর সহযোগিতা। বেগমের কাছে যখন মির্জা দূত পাঠালেন, তখন বেগম সেই দূতকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার প্রভুর কি পৌরুষ আছে? আছে বীরের ন্যায় সাহস ও শক্তি?

এমন অনিন্দ্যসুন্দরী ললনার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দূত শুধু এই জবাব দিলে—কী সুন্দর দেখতে আমার মনিব, খোদার কুদরতে তাঁর রূপের তুলনা নেই।

বেগম রোষকষায়িত লোচনে দূতের দিকে চেয়ে বললেন—'থোৎ, এ কী তামাসা হচ্ছে! বল তোমার মনিবের তলোয়ার চালাবার ক্ষমতা আছে কি না এবং বীরের ন্যায় লড়াই করে রাজ্য জয় করতে পারে কি না। না, শুধুই ঢাকঢোল বাজাবার নেশা আছে তাঁর?' সৌন্দর্যের মোহ বেগমের নেই, বেগম বীরের উপাসিকা।

সম্রাটের প্রাসাদে মির্জার স্থান হল না। বিতৃষ্ণায় মির্জা প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। সম্রাটকে নিরাপদ রাখার জন্যে কেউ রইল না প্রাসাদে।

বেগমের সেই পাতান ভ্রাতা গোলাম কাদির আবার একদিন প্রাসাদ আক্রমণ করলে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে। সম্রাটকে বন্দী করে গোলাম কাদির তাঁর চক্ষু দুটি উৎপাটন করে একজন চিত্রকরকে ডাকল। গোলাম কাদির ছুরিকা হাতে সম্রাটের বুকের উপর বসে তাঁর চক্ষুকোটরে ছুরিকা চালিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে তুলছে মাংস—এই ছবি তুলতে হবে চিত্রকরকে। চিত্রকরের ছবি তোলা হয়ে গেল। তারপর হারামের ধনরত্ন সব লুঠ করে বেগমদের সকলকে নগ্নাবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল গোলাম কাদিরের সামনে। কাদিরের সে কী চরম উন্মত্ততা তখন!

সিন্ধিয়া এ খবর পেয়ে দক্ষিণাচল থেকে ফিরে এলেন উত্তরে। সম্রাটকে উদ্ধার করে এবার গোলাম কাদিরের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। কাদিরকে বন্দী করে তার গলায় শিকল পরিয়ে কুকুরের মত তাকে আনা হল একটা খাঁচায় পুরে সিন্ধিয়ার সম্মুখে; কাদিরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হল। অতঃপর সিন্ধিয়া কাদিরের দুটি কান আর দুটি চোখ উপহার স্বরূপ পাঠালেন সম্রাটের কাছে। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'।

১৭৯০ সাল। বেগম সমরুর তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা। মর্যাদাও তাঁর তখন উঠেছে উচ্চশিখরে। এমন সময় এক সুশ্রী, সুদর্শন, শিক্ষিত ফরাসি যুবক এসে বেগমের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। লেভাসো তার নাম। যে সব অশিক্ষিত সেনা তাঁকে ঘিরে থাকত তাদের থেকে এ যুবক সম্পূর্ণ পৃথক। যুবকটি শুধু সেনাদলেই ঢুকল না, ঢুকল একেবারে বেগমের হৃদয়কন্দরে। এই যুবকের সঙ্গে সঙ্গে এল বেগমেরও দুর্দিন। এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি তাঁর নব প্রণয়ীর প্রেমে যে, একদিন গোপনে তিনি তাকে বিবাহ করে ফেললেন। যুবকটি এমনই প্রমত্ত হয়ে উঠল যে বেগমের সঙ্গে তার আচার-আচরণ অনেক সময় অশোভন হয়ে উঠত। কলঙ্ক রটল চারিদিকে। সেনাবাহিনীতে চরম অসন্তোষ দেখা দিল। বেগমের টেবিলে ঘিরে বসে যারা এতদিন খানা-পিনা করেছে তারা আজ যেন অবহেলিত অপাংক্তেয়। বেগমের প্রতি তাদের আনুগত্য দূরে সরে যেতে লাগল। বেগমের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে তাঁর পরামর্শদাতা যে জর্জ টমাস সে বেগমকে পরিত্যাগ করে সিন্ধিয়ার সৈন্যদলে গিয়ে যোগ দিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সে একদল

সৈন্ত নিয়ে বেগমের রাজধানী আক্রমণ করল, বেগম তাঁর দুরবস্থা বুঝতে পারলেন। কোন বিশ্বস্ত অনুগত সৈন্তকেই তো আর তিনি পাশে পাবেন না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি বৃটিশ সৈনাধ্যক্ষের করুণা ভিক্ষা করলেন। বললেন তাঁর রাজ্যলালসা ফুরিয়ে গেছে। ধন সম্পদও আর তিনি চান না, চান শুধু তাঁর প্রাণটুকু আর প্রাণাধিক প্রিয়তম তাঁর প্রণয়ীকে তাঁরই পাশে। তাহলেই তাঁর শান্তি।

প্রণয়ী লেভাসোকে সঙ্গে নিয়ে বেগম তাঁর রাজধানী ছেড়ে পলায়ন শুরু করলেন। পিছু পিছু ধাওয়া করল তাঁর বিদ্রোহী সেনাদল। পাল্কির ভিতরে বেগম আর তাঁর পাশাপাশি চলেছে তাঁর অশ্বারোহী প্রণয়ী। অনুসরণকারী সেনাদল বেগমকে প্রায় ধরে ফেলেছে এমন সময় তাঁর ফরাসি প্রণয়ী হৃদয়-গলান-সুরে চুপি চুপি শোনাল—এই বর্বরদের হাতে মৃত্যুর চেয়ে আমি বরং নিজেই আমার জীবন শেষ করব।

বেগমেরও বীরত্ব তাঁর প্রণয়ীর চেয়ে কিছু অংশে কম নয়। বুকের আড়াল থেকে একখানি ছুরিকা বার করে দেখালেন তিনি লেভাসোকে, মরণেও তিনি তার সঙ্গ ছাড়বেন না। লেভাসো এগিয়ে চলেছে, কিছুক্ষণ বাদে এককাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ একটা মর্মভেদ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে লেভাসো পিছিয়ে এসে দেখে পাল্কির ভিতর তার প্রেমিকা মূর্ছিতা, অঙ্গবাস রক্তাক্ত। লেভাসো তৎক্ষণাৎ তার নিজের কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ল পিস্তলের গুলি—গুড়ুম! সব শেষ—প্রণয়ীর জীবনান্ত হল!

সৈন্তেরা বেগমকে বন্দী করে ফেলল। দেখা গেল বেগমের সাংঘাতিক কিছু হয় নি, গলার নিচে হাড়ের উপর খানিকটা আঁচড় লেগেছে মাত্র। বেগম কি সত্যি সত্যিই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, না তাঁর প্রণয়ীকে উৎখাত করার এটা একটা ছলনা মাত্র? নানা লোকে নানাভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেয়।

যাক সে কথা। বেগমের বিদ্রোহী সৈন্তগণ তাঁরই রাজধানীতে তাঁকে বন্দিনী করে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সাত দিন ফেলে রাখল উন্মুক্ত আকাশের নিচে খররৌদ্রে। না আহার, না পানীয়। একটি সদয়া পরিচারিকা কেবল গোপনে বেগমের চাহিদা মেটাত।

বেগমের ভাগ্যবিপর্যয় হলেও তাঁর বুদ্ধি কিন্তু নিষ্প্রভ হয় নি আদৌ। তাঁর সৈন্ত বিভাগের মধ্যে একটি মাত্র ফরাসি অফিসার তাঁর অনুকূল ছিলেন, তিনি জানতেন বেগমের গোপনে বিবাহের ব্যাপারটা। এই অফিসার মারফৎ বেগম

এক করুণ পত্র পাঠালেন তাঁর পুরান অনুরাগী সেনানায়ক জর্জ টমাসের কাছে। টমাসের হৃদয় বিগলিত হল, তারই সাহায্যে বেগম ফিরে পেলেন তাঁর স্বাধীনতা, ফিরে পেলেন তাঁর জায়গির। এবার নতুন করে জায়গির পরিচালনা শুরু হল, শুরু হল সেনাবিভাগের পুনর্গঠন। রাজনীতিতে বেগমের প্রতিভার স্ফুরণ আবার দেখা দিল। তাঁর দূরদৃষ্টিতে তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন ব্রিটিশের অভ্যুত্থান ক্ষণিক নয়, এটা হবে দীর্ঘস্থায়ী। তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। নানাভাবে তিনি ইংরেজকে জানিয়ে দিলেন তাঁর অন্তরের কথা। তার সারমর্ম এই যে, ইংরেজদের আওতায় থেকে তাঁর জায়গির চালিয়ে যেতে পারলে তিনি পরম খুশি হবেন এবং দরকার হলে তাঁর সেনাবাহিনীও তাঁদেরই কাছে সমর্পণ করতে তিনি রাজি। স্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে ইংরেজ রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখাও করলেন। ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ। অতুল রূপ আর অদ্ভুত বাক্‌বৈভব তাঁর। টানা দুটি কমনীয় কালো চোখের মাদকতা অপরপক্ষকে বিহ্বল করে তুলত।

উত্তর ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ জেনারেল তখন লেক। এই লেকের সঙ্গে একদিন স্বয়ং দেখা করতে গেলেন বেগম সমরু।

বোরখাহীন অবস্থায় হাসি মুখে দাঁড়ালেন বেগম জেনারেলের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে। হিন্দী ও পার্শি ভাষা তিনি বলতে পারতেন অনর্গল অবলীলায়।

ভারতীয় রমণীর এমন রূপ লেক জীবনে কখন দেখেন নি। ঐ কালো চোখের মদালস চাহনি, ঠোঁটের দুকূলে ঐ অনিন্দ্যসুন্দর হাসি আর ঐ কাঁচা সোনার রঙ এখনও এই বয়সে। সাহেবের মাথা ঘুরে গেল, তিনি সংযম হারিয়ে ফেললেন। ছুটে এগিয়ে গিয়ে তিনি বেগমকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এক সশব্দ চুম্বন তাঁর গালে এঁকে দিয়ে বললেন—আঃ! আনন্দগদগদ সাহেবের পা দুটি তখন টলছিল।

প্রকাশ্য দিবালোকে বেগমের কতগুলি অনুচর ও জেনারেলের বহু অফিসারের সামনে বেগমের এইরূপ ইজ্জতহানিতে সবাই হকচকিয়ে গেল। কিন্তু বেগম ধীর, স্থির, অতি সহজে শান্তকণ্ঠে হাসতে হাসতে তিনি সকলকে শুনিয়ে বললেন—দেখলে তো তোমরা, অনুতপ্ত কন্যাকে তার 'ফাদার' কিভাবে আদর করেন।

অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সুরাপায়ী জেনারেলকে গীর্জার পাদ্রির পর্যায়ে তুলে ধরার কৌশলকে সত্যিই তারিফ করতে হয়। জেনারেল কিন্তু চিরবন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর 'কন্যার' সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

লর্ড ওয়েলেসলি কিন্তু অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন। তিনি বেগমের জায়গির ও সেই সঙ্গে তাঁর সেনাবাহিনীর কিছু অংশ দাবি করে বসলেন আর বললেন তার বদলে বেগম পাবেন আগ্রার কাছে কিছু ভূসম্পত্তি।

এদিকে 'নারীরত্ন' খেলতে লাগলেন তাঁর কূটনীতির খেলা। ভারতের খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি নিজেদের তাঁবে এনে একাধিপত্য করবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে তখন ইংরেজদের। বেগম একবার বলেন হোলকারকে যে তাঁর মত বন্ধু আর কেউ নেই, তিনি তাঁরই দলে যোগ দেবেন। ওদিকে আবার শিখ শাসককে উত্তেজিত করে তোলেন ইংরেজদের ভূসম্পত্তি অধিকার করতে। পক্ষান্তরে ইংরেজের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করে তাদের অহমিকার গোড়ায় সুড়সুড়ি দিতেও ছাড়ছেন না। এমনকি একবার এক ইংরেজ অফিসারকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করে তাকে পরম আদরে রাখলেন নিজের আশ্রয়ে। বেগমের আতিথেয়তার বিলাসের অন্ত ছিল না।

একবার লেঃ কর্নেল অকটারলোনিকে এক পত্রে জানালেন—

আপনি আমার ভাই। ভাই যদি এসে তার বোনের হাত ধরে তাকে তার ঘরের বাইরে তাড়িয়ে দেয় তবে অন্য কোথাও আশ্রয় নেবার স্থান কি আর তার নেই? দুনিয়াটা এত ছোট নয় এবং আমার পা দুটোও এখনও চালু আছে। যে কোন একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে সেখানে আমি পরাচিন্তায় মন দেব।

এটাও তিনি চিন্তা করে দেখে নিয়েছেন যে, তাঁকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। তাঁর শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, তাঁর প্রয়োজন এখনও বোধ হয় ফুরিয়ে যায় নি। ইংরেজ এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, তাঁকে হাতছাড়া করলে তিনি যোগ দেবেন মারাঠিদের সঙ্গে। মারাঠিরাও তাঁর আনুকূল্য লাভের আশা ছাড়ে নি তখন। বেগম অনমনীয়া। কোন দিকেই ঢলে পড়েন নি—দেখা যাক জল কতদূর গড়ায়। কূটনীতির দাবা খেলায় তিনি অদম্য।

লর্ড ওয়েলেসলির কাল শেষ হল। এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। এইবার তাঁর সুরাহা হল। তিনি জায়গির ফিরে পেলেন সবটাই। শাসন কর্তৃত্বও তাঁর। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় এখন তিনি বসলেন তাঁর শেষ জীবনের মহিমাময় কাজে।

এখন থেকে তাঁর কাজ হল জনকল্যাণ-সাধন আর গির্জার গৌরববৃদ্ধি করা। তাঁর শাসনকার্য কড়ি ও কোমলে মেশা। তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল জায়াজুলে। বেগমের উৎসাহ ও আনুকূল্যে প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রচুর ফসল। সবারই আনন্দ আর ধরে না। তখনকার দিনে বেগমের ভূখণ্ডের মত সমৃদ্ধিশালী স্থান আর

কোথাও ছিল না। তাঁর এলাকায় উঠল বড় বড় ইমারত, ধর্ম-মন্দির, জলাশয়, পুল প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজ।

১৮০১ সালে বেগমের রাজধানী সারধানায় এক বিরাট গির্জা নির্মাণ শুরু হল, সেণ্ট পিটার গির্জার আদর্শে। ইটালি দেশ থেকে এল বড় বড় মার্বেল পাথর, এল এক প্রখ্যাত ভাস্কর, এল চিত্রশিল্পী। প্রায় বিশ বছর লেগেছিল এই গির্জা নির্মাণ শেষ হতে।

চিত্রকরের অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়ে মূল চিত্রখানি বেগম পাঠিয়ে দিলেন তখনকার দিনের 'পোপ'-এর কাছে। চিত্রখানি এখনও আছে রোম নগরীতে। এর একটা নকল রাখা হয়েছে লক্ষ্ণৌ রাজভবনে।

একজন ফরাসি পর্যটক এদেশে এসে বেগমের রাজধানীতে তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছিলেন তার একটা বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন। সেই বর্ণনায় তিনি বলেছেন, বেগম যেন একটা চলন্ত 'মমি'। প্রত্যেক ব্যাপারে স্বয়ং তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন, একই সঙ্গে দু-তিনটি সেক্রেটারির কথা তিনি কানে শোনেন এবং আরও অনেককে একইকালে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে আদেশ দেন। এমনই অদ্ভুত কর্মশক্তি তাঁর।

অর্ধ শতাব্দীকালেরও উপর বেগম সমরু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহীয়সী নারীরূপে নিরন্তর চমকসৃষ্টি করে গেছেন। সাহসে, বুদ্ধিমত্তায়, চাতুর্যে, কর্মদক্ষতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। শাসনকার্যে নিপুণা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অতুলনীয়া। মানবপ্রেমের পূজারিণী ছিলেন তিনি, কিন্তু প্রয়োজন হলে সে প্রেমকে তুচ্ছ বলে হেলায় পদদলিত করতেও ছিল না তাঁর কোন দ্বিধা।

১৮৩৬ সালে এই মহীয়সী মহিলার জীবনান্ত ঘটে।

লক্ষ্ণৌ রাজভবনে আজও তাঁর একখানি বিরাট তসবির বিরাজমান। প্রায় সত্তর বছর বয়সের খর্বাকৃতি মহিলার ছবি এখানি। মুঘল ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ। গায়ে একখানি মোটা কাশ্মীরি শালের আচ্ছাদন, হীরামুক্তাখচিত ডান হাতখানি কোলের উপর ন্যস্ত, বাঁ-হাতের আঙুলে কুণ্ডলী-পাকানো আলবোলার নলটি ধৃত, পায়ে নাগরাই, মাথায় একটি অদ্ভুত ধরনের টুপি। সূচাগ্রনাসায় লক্ষ্যভেদের অমোঘ একাগ্রতা, ওষ্ঠাধরে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আর টানা দুটি মদালস চোখে সারা জীবনের বিস্ময় যেন স্থির বিদ্যুতের মত থমকে আছে।

১৭

বন্ধুবর প্রমোদ সেনের মতো স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। তিনি ছিলেন আমার সহকর্মী এবং সমধর্মী। রাজনীতিতে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করতেন তাতে বেশ বুঝতে পারতাম, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।

পিতা যোগেন্দ্রনাথ উকিল ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ঐ আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। আদর্শ হিসাবে তিনি অরবিন্দের আদর্শই অনুসরণ করতেন এবং তখনকার দিনে 'বন্দে মাতরম্‌' 'কর্মযোগিন্‌' ও 'ধর্ম' পত্রগুলির তিনি ছিলেন গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক। প্রমোদ সেন তখন বালক মাত্র। পিতার কার্যকলাপ ও তাঁর পাঠানুরাগ বালকের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাত। পাকা মন না হলেও সেই অপরিণত মনের কোন কোণে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল পিতার আদর্শের একটি বীজ। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল তাঁর যৌবনে। তিনিও পিতার ন্যায় ওকালতি পাশ করে আদালতে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করেছিলেন, এমন সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' প্রকাশিত হল। এই ফরোয়ার্ড কাগজেই সহসম্পাদকরূপে যোগদান করে তিনি আজীবন সাংবাদিক বৃত্তিই ধরে ছিলেন।

ফরোওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানে প্রমোদ সেনের যোগদানের প্রায় বছর দুই পরে আমিও ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম এবং কিছুকালের মধ্যেই প্রমোদ সেনের চরিত্রের মাধুর্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মুখে তাঁর সব সময় এক অনিন্দ্য নির্মল হাসি লেগে থাকত। হৃদয়ে কোন মালিন্য না থাকলে বোধ হয় অমন হাসিটি ফুটতে দেখা যায়। রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনার মধ্যেও লক্ষ্য করতাম তাঁর অধ্যাত্মতত্ত্ব জানবার ও বুঝবার প্রতি আকূতি।

আমার তখন বৈত সত্তা থাকে আর্য পাবলিশিং হাউসে—যেখান থেকে প্রধানত শ্রীঅরবিন্দের পুস্তক প্রকাশিত হয়। আমি যাঁর কাছ থেকে ওখানকার কার্যভার গ্রহণ করেছি তাঁর কথা প্রমোদ সেনকে প্রায়ই বলতাম। নরেন দাশগুপ্ত তাঁর নাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল মণি—দর্শনশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল; এম. এ পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

কী অদ্ভুত ভাববিহ্বল লোক ঐ নরেন দাশগুপ্ত! বেশ মনে পড়ে গোড়ার

দিকে আমার প্রুফ দেখায় হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁরই কাছে। ১৯২৬ সালের কথা। শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita-র প্রুফ দেখছিলাম দুজনে। তিনি প্রুফপাঠক আর আমি পাণ্ডুলিপির ধারক। হয়ত অবতারবাদের পরিচ্ছেদ পড়া হচ্ছে। একটা শব্দ উচ্চারণ করেই থেমে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে হাসতে লাগলেন। মিনিট দুই তিনি ঐ ভাবেই চেয়ে রইলেন, তারপরে তাঁর মুখে আবার কথা ফুটল। বুঝলাম ঐ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁকে বিহ্বল করেছে। ভাবের মাধুর্য আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কিছুক্ষণ ধরে। কোন শব্দের আদ্যাক্ষর কেন বড়ো হল আবার কোনটারই বা ছোট কেন তা বোঝাতে গেলেও তাঁর আনন্দোজ্জ্বল চোখের চাহনি হয়ে যেত অন্যরকম। কী অদ্ভুত লোক রে বাবা! এদিকে 'সময় বহিয়া যায়, কারও পানে নাহি চায়—' এ সতর্কবাণী তাঁর কাছে তুচ্ছ।

এক সময় বললাম—নরেনবাবু এভাবে প্রুফ দেখলেই তো হয়েছে। কবে যাবে এর শেষ প্রুফ শ্রীঅরবিন্দের অনুমোদনের জন্যে আর কবেই বা ফেরৎ আসবে এখানে তাঁর কাছ থেকে?

দার্শনিক নরেনবাবুর কথা আমার কাছে শুনে শুনে প্রমোদ সেন নরেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আকুল হলেন। একদিন আমাকে বললেন তাঁর কতকগুলি বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে—সেগুলি তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। রাজনীতির গোলকধাঁধায় তিনি ঘুরছেন। একে সাংবাদিক তায় উপর আবার অধ্যাত্ম-পিপাসু। ধাঁধায় ঘুরে বেড়ান তো খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে শ্রীঅরবিন্দ যে পথ দেখিয়েছেন সে পথের প্রান্তে ভারতবর্ষ যে এক উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে একটা নিঃসন্দেহ আশা পোষণ করে নি কে? কিন্তু সেই পথের দিশারি আজ কোথায়? এক পথ ছেড়ে অন্য পথে পা বাড়াবার আহ্বান দিয়েছেন তিনি। নিঃসন্দেহে সে পথে যাবার সাহস আছে কৈ?

আরও বিপদ হল ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন আশ্রমে শ্রীমায়ের উপর বাইরের সমস্ত কাজের ভার দিয়ে একেবারে অন্তরালে চলে গেলেন একান্তে গভীর সাধনায় মগ্ন হতে। আরও বৃহত্তর সত্য আছে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে—যেতে হবে সেইখানে।

প্রমোদ সেন বললেন—আমরা তো তাঁরই দিকে চেয়ে ছিলাম এবং এখনও আছি। জানি তিনিই এসে আবার এই রাজনীতির হাল ধরবেন। কিন্তু হতাশ হয়ে পড়তে হচ্ছে যে। দেশে আবার নেতৃত্ব করবার জন্যে বার বার আহ্বান গেছে

তাঁর কাছে, কিন্তু কোন সাড়া নেই তাঁর। এটা আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য।

নরেনবাবু বললেন প্রমোদবাবুকে—শ্রীঅরবিন্দের ওপর বিশ্বাস রাখুন। তাঁর জীবনধারা লক্ষ্য করে আসুন। বিদেশে তাঁর শিক্ষা সমাপ্তির পর দেশের মাটিতে যেই পদার্পণ করলেন, অমনই তাঁর দেশাত্মবোধ একটা অপার্থিব প্রশান্তির মধ্যে জেগে উঠল। অবিমিশ্র বিদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ যে উকি-ঝুঁকি মারছিল, এটা তো আপনার অজানা নেই। তারপর স্বদেশে এসে রাজনীতি ক্ষেত্রে যখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখনি আমরা কি দেখতে পাই? তাঁর কার্যকলাপ, তাঁর কারাভোগ, তাঁর উদাত্ত-গম্ভীর বাণীর মধ্যে আমরা পেলাম স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তির স্বরূপ। রাজনীতির অর্থ দেশকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর রাজনীতিতে নামার অর্থ দেশের স্বরূপকে আবিষ্কার করা—এই স্বরূপের পূর্ণতর রূপের সন্ধানই চলেছে তাঁর অধ্যাত্মসাধনায়। এর মধ্যে তো কোন অসঙ্গতি নেই। আমরা স্বাধীনতার বাহ্য রূপকে দেখে মুগ্ধ হই। কিন্তু সে স্বাধীনতা শ্রীঅরবিন্দের নয়, তাঁর স্বাধীনতা অন্তর্লোকের পূর্ণ জ্যোতিতে ভাস্বর। সত্যের খণ্ড রূপ বা অর্ধসত্য নিয়ে তিনি কারবার করেন না। সত্যের পূর্ণতম জ্যোতির দিকেই তাঁর লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে যতদিন না তিনি পৌঁছবেন ততদিন তাঁর যাত্রার পূর্ণচ্ছেদ নেই। ধৈর্য হারালে তো চলবে না প্রমোদবাবু।

প্রমোদ সেনের নেশা লেগেছে। পুরানো 'আর্য' সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করে দিলেন। বিরাট সমুদ্র। ঐখানে নিহিত আছে কত মণিমুক্তা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৪ সালের আগস্টে। সে যুদ্ধের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার আভাস ছিল তাঁর লেখায়। জগতের বিভিন্ন জাতির একটা গোষ্ঠী-সঙ্ঘের গোড়াপত্তন হবে যুদ্ধ শেষে, কিন্তু সে সঙ্ঘও ব্যর্থ হয়ে যাবে কিছুকাল পরেই। তবু ঐ সঙ্ঘের মধ্যেই উপ্ত হয়ে রইল সর্ব-মানবের মিলিত কল্যাণ সাধনের বীজ। হয়ত ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে একদিন বৃক্ষে পরিণত হবে আর আমরা তার ফল ভোগ করতে পারব।

আর একদিনের কথা। প্রমোদ সেন একদিন একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

কতদূর দৃষ্টি গেলে যুদ্ধের পরিণতি কোন্ দিকে মোড় ফিরবে তা বলা যায়? তা যে শ্রীঅরবিন্দের যোগলব্ধ শক্তিরই ইঙ্গিত, সে সম্বন্ধে প্রমোদ সেনের আর

সংশয় নেই। তাঁর প্রস্তাবের কথা তাই নরেনবাবুর কাছে প্রকাশ করলেন আজ। মুখে তাঁর সেই অনিন্দ্যসুন্দর হাসি।

নরেন দাশগুপ্ত অতঃপর বললেন—তাহলে দেখছেন প্রমোদবাবু, শ্রীঅরবিন্দ শুধু নিজের মুক্তি নয়, স্বদেশের মুক্তি নয়, সমগ্র বিশ্বের মুক্তির জন্যে সাধনায় বসেছেন। তাঁর Evolution বইখানা পড়েছেন তো। মানুষের বিবর্তনের ধারা কোন্ দিকে চলেছে এবং কোথায় তা যাবে তার নির্দেশও এই বইখানা থেকে পাওয়া যায়। এটা তাঁর পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের বুদ্ধিবৃত্তিচালিত একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতমাত্র নয়। নিজের জীবনে উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ। Ideal of Human Unity-তে ভবিষ্য মানব সমাজ আরও কতদূর এগিয়ে যাবে তারও ইঙ্গিত পাই না কি?

এর কিছুদিন পরেই নরেন দাশগুপ্ত আমার উপর কাজের ভার দিয়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমে চলে গেলেন। বছর পাঁচেক পরে নরেনবাবু কোন কার্যসূত্রে আবার এসেছিলেন কলকাতায় এবং আমার কাছেই ছিলেন দিন কতক। খবর পেয়েই প্রমোদবাবু নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। এবার আর কোন প্রশ্ন নয়। আনন্দবিগলিত তাঁর মুখের অম্লান হাসিতেই তাঁর হৃদয়ের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল।

আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র প্রমোদ সেনের সঙ্গেই আমার হৃদয়ের সম্পর্ক হয়েছিল গভীর হতে গভীরতর। কিন্তু আমাদের কাগজের প্রতিষ্ঠানের সমাধির পর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম—অন্নসংস্থানের চেষ্টায় আমি গেলাম অন্যত্র। প্রমোদ সেন ছিলেন জাত সাংবাদিক, তিনি সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করতে পারলেন না কিছুতেই। কিছুদিন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাডভান্স' পত্রিকায় কাজ করলেন, তারপর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং সর্বশেষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যোগদান করে আমৃত্যু ঐ কাগজেরই সেবা করে গেছেন।

প্রমোদ সেন পত্রে একদিন তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাসায় আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। গিয়ে দেখি সেখানে শিল্পী প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত। সুদীর্ঘ দেহ তাঁর, আর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য। অদ্ভুত আত্মভোলা লোক! এমনটি আর দেখি নি, কোন স্থানে দীর্ঘক্ষণ স্থিতির কোন চিহ্নই যেন নেই তাঁর বিশাল দুটি ভাসাভাসা চোখে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ফেরবার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখেন একটি পয়সাও নেই। নিঃসংকোচে চারটি পয়সা ট্রামভাড়া নিয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

ঐ প্রখ্যাত শিল্পীর 'ভারতশিল্পের সাধনা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল তিনি ভারতের নানাস্থানে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরেছিলেন শিল্পসাধনার উৎস সন্ধানে। বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে এবং বর্তমানে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেরই অধিবাসী।

প্রমোদ সেন কলকাতা থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার এলাহাবাদ শাখায় স্থানান্তরিত হয়ে সেখানেই কাটিয়েছিলেন তাঁর জীবনের বাকি অংশ। তিনি কলকাতা থাকতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার মুখেই শ্রীঅরবিন্দের একখানি জীবনী প্রকাশ করেন। এই জীবনীতে যোগীবরের জীবন ও যোগ সম্বন্ধে তিনি যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর শ্রদ্ধাশীল মনের অনুসন্ধিৎসা ও অপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ শুধু মহাযোগীর যোগের ভাষ্য নয়, সেই ভাষ্যের সঙ্গে লেখকও যে উঠে গেছেন অনেক ঊর্ধ্বে, তাও ভেসে ওঠে পাঠকের মনের পর্দায়।

এলাহাবাদে আমাদের বন্ধুমহলে দুটি প্রবল আকর্ষণ ছিল—এক সুধাংশু মুখোপাধ্যায় আর অন্যটি প্রমোদ সেন। সুধাংশু মুখোপাধ্যায় আমাদের সকলের কাছে সুধাদা। বারাণসীতে কাটিয়েছিলেন দীর্ঘকাল, তারপর তাঁর ছেলেরা কাজসূত্রে এলাহাবাদে গিয়ে বাসা বাঁধলে তিনি সেইখানেই কাটিয়েছিলেন জীবনান্ত পর্যন্ত। এত বড় রবীন্দ্র-ভক্ত জীবনে আর দেখি নি। শুধু ভক্ত বলতে যা বোঝায় তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যেন তিনি ডুবে থাকতেন সারাক্ষণ আর সেখান থেকে মণিমুক্তা কুড়িয়ে এনে ছড়িয়ে দিতেন বাইরে। বারাণসীতে তাঁর বাসায় এক একদিন আসর দেখেছি রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। কী অপূর্ব তাঁর কণ্ঠ আর কাব্যের রসবিস্তারে কী দৃঢ়-প্রত্যয় সংশ্লেষ। এমন আবৃত্তি আর কারও মুখে শুনি নি আজ পর্যন্ত। আর একটা বৈশিষ্ট্য তাঁর লক্ষ্য করতাম—যেকোন বিষয়ের আলোচনা হক না কেন, রবীন্দ্রনাথকে সেখানে টেনে এনে অনুরূপ ভাবাত্মক একটি কবিতার আবৃত্তি করে ছেড়ে দিতেন। ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, তর্কের কোন অবসর নেই সেখানে। অর্থটি যেন ঝর্ণার মত ঝরঝর করে ঝরে পড়ত। অথচ এই মহান ব্যক্তি লিখে রেখে যান নি কিছুই। যেন রবীন্দ্র-কাব্যের সুরের মধ্যে ডুবে থাকাই তাঁর সাধনা, আর কিছুরই প্রয়োজন নেই তাঁর।

কলকাতার সুধী সমাজে সুধা মুখুজ্যের নাম জানতেন না এমন লোক ছিলেন না। বিশেষ করে শরৎ চাটুজ্যে ও শিশির ভাদুড়ীর তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

তখনকার নাট্যশালায় শিশির ভাদুড়ী তাঁর যেকোন নাটকের অভিনয়ে সুধা মুখুজ্যের মতামত না পেলে খুশি হতে পারতেন না।

এই এলাহাবাদেই লুকারগঞ্জে থাকতেন সাংবাদিক প্রমোদ সেন। দূরে দূরে থাকলেও আমাদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান ছিল, তবু মনে হত যেন আত্মার এক অংশ ছিঁড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এলাহাবাদে গেলেই তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হই নি।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে এক চিঠিতে আমাকে বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনা-কাতর মনের কথা জানালেন। আহা, কী সেই মধুর দিনগুলি আমাদের কেটেছে। লিখেছিলেন—

মনে হয় কতকাল আমাদের দেখা হয় নি। দেখছি সংসার কিভাবে বদলে যাচ্ছে, আর আমরাও চলেছি বার্ধক্যের দিকে। যৌবনের সে স্বপ্ন, উৎসাহ কোথায়? নতুন মানুষ আর নতুন তাদের চিন্তাধারা। আমরা হটে যাচ্ছি, এখন মুমূর্ষোস্তৃতীয় পন্থাঃ।

ঐ চিঠিতে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, তিনি এলাহাবাদ থেকে কয়েকবার পণ্ডিচেরি ঘুরে এসেছেন এবং সেখানে নরেন দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা হওয়ায় কী যে আনন্দ তাঁর হয়েছিল তা বলা যায় না। তাঁর প্রথম সংস্করণের বইখানি বর্ধিত আকারে পণ্ডিচেরি আশ্রম থেকেই দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়েছিল।

এর মাসখানেক পরে আবার একখানি চিঠি পেলাম বন্ধুবরের কাছ থেকে। লিখেছেন—আজকাল অফিসের প্রায় সমগ্র ভার আমার উপর। তারপর আজকালকার দিনে দেশের, দশের নানা ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা ও এলোমেলো চিন্তা। কিছুই যেন ভাল লাগে না। মনে হয় আমাদের যুগ ফুরিয়ে গেছে। ওরই মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের কাজ একটু-আধটু করে যা আনন্দ পাই। অন্যদিকে জীবন যেন পূর্ণচ্ছেদের কাছে ঘেঁসছে।

বর্তমান দুর্দিনে আপনি কি করে দিন চালাচ্ছেন অনুমান করতে পারি। এরকম উজান বইতে বইতে সারাজীবন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন যেন শিথিল হয়ে আসে। শ্রীঅরবিন্দ নতুন যুগের কথা বলছেন তাই যা ভরসা, কিন্তু তার আগে একটা মহাপ্রলয় হবে কিনা ভগবানই জানেন।

বন্ধুবরের চিঠিতে হারিয়ে যাওয়া পুরাতন দিনগুলির বেদনা ফুটে ওঠে আর সে বেদনা আমারও হৃদয়ে ঢেউ তুলে যায়।

১৯৫২ সালের এপ্রিলে একদিন অকস্মাৎ বজ্রাহত হলাম। খবর পেলাম প্রবোধ সেন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রবোধ সেনের সেই চির-সুন্দর হাসিটি যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে। মনের পর্দায় যেসব ছবি সিনেমার ছবির মত একে একে ফুটে উঠে দূরে সরে গেল তাদের সবারই মুখে এক অনির্বচনীয় হাসি। দুদিনে, দুঃখ-দুর্দশায়, রোগে শোকে, নৈরাশ্যে ঐ একই হাসির জ্যোতি দেখতে পেতাম। তাই তাঁর সান্নিধ্যে খুঁজে পেতাম জীবনধারণের গ্লানির মধ্যেও একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা, নিবিড় বন্ধুত্বের একটা আনন্দময় আশ্লেষ!

লুকারগঞ্জের আবহাওয়া থেকে সরে গেছে সেই চির-অম্লান সুন্দর হাসিটি—চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে প্রয়াগ-সঙ্গমের চিতাভস্মে!

১৮

বিজয় নাগ আসার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর চাল-চলন, কথাবার্তায় কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করতে লাগলাম। তিনি স্বল্পভাষী। যদিবা কখনও কথা বলতেন তাতে যেন একটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠত, মুখে হাসির কোন বালাই ছিল না। ভাবতাম যোগাভ্যাসের ফলে হয়ত তিনি বাকসংযমী হয়েছেন। মাঝে মাঝে দু-একটি কথা যা বলতেন তাতে এই আভাস পেতাম যে, এই প্রকাশনার কেন্দ্রটি একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে। বিজয় নাগ কি শ্রীঅরবিন্দের কোন নির্দেশ নিয়ে এখানে এসেছেন? কোন্ সে নতুন পরিকল্পনা? অর্থ কে দেবে?—ইত্যাদি কোন প্রশ্নের জবাব পাওয়ার সম্ভাবনা নেই; কারণ কোন বিষয়ের আলোচনা আমার সঙ্গে করা তাঁর নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের কাগজের অফিস তখন লালবাতি জ্বেলেছিল, সুতরাং আমি তখন সারাদিন এই দোকানেই কাটাতাম। বিজয় নাগের ভাইপো অর্থাৎ আসল মালিকের পুত্র রাধাকান্ত ওরফে বিশ্বনাথ কিছুকাল থেকে আমার সঙ্গেই দোকানে থাকত। আমি তো আর এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে আসি নি। বিশ্বনাথকেই তো ভবিষ্যতে এই দোকান চালাতে হবে, তাই তাকে তালিম দিচ্ছিলাম।

ঢেলে সাজা শুরু হল—টেবিলটা ঘুরিয়ে দেওয়া হল একটু ওদিকে। সামনের দিকে একটু জায়গা বেশি করার জন্যে সামনেকার একটা আলমারি চলে গেল পিছন দিকে। একখানা লম্বা টেবিল ছিল সামনের দিকে, সেখানা এল ঘরের

ঠিক মাঝখানে। দেখলাম রাত্রে তার উপর বিছানা ছড়িয়ে বিজয় নাগ শয়ন করতে লাগলেন।

শয়নের আগে তাঁর ধ্যানের ব্যবস্থা। টেবিলের চারদিকে গুটিকয়েক ধূপ জেলে দিয়ে একখানা চাদরে চোখমুখ ঢেকে আলোটি নিবিয়ে দিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। আমি এই সময় বাইরে বেরিয়ে গেলাম রাত্রির আহারাদি সেরে আসতে।

সপ্তাহখানেক এইভাবে কেটে যাবার পর একদিন ডাকপিওন এসে আমার টেবিলে একখানা চিঠি ফেলে গেল। 'পিওনের সাড়া পেয়েই বিজয় নাগ পিছনের দিক থেকে ছুটে এসে আমার নামলেখা চিঠিখানি দেখেই চিলে যেমন কোন খাবার ছোঁ মেরে নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে যায় তেমন করেই ঐ চিঠিখানি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সরে পড়লেন। আমি এঁর কাণ্ড দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। এ কী রকম ভদ্রতা বুঝলাম না!

খানিকক্ষণ বাদে আমার টেবিলের সামনে বার কয়েক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন—এ নলিনীর কীর্তি, নলিনীর কীর্তি। বুঝি না আমি সব? সব বুঝি। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

রাগে তাঁর সমস্ত মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। দ্রুত পদসঞ্চারের সঙ্গে তাঁর শরীরে একটা অস্বাভাবিক কম্পন লক্ষ্য করছিলাম।

ঐ চিঠিতে এমন কি আছে যার জন্যে তাঁর এই উত্তাপ? সবই যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার! কিন্তু সে রহস্য ভেদ করার কোন উপায় নেই, কারণ পরের নামে চিঠি যেন তাঁরই সম্পত্তি। সে চিঠি চিঠির মালিককে ফেরৎ দেওয়ার প্রয়োজন তাঁর নেই।

যাক। এ রহস্য ভেদ করার আগে বিজয় নাগের কিছু পূর্ব পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয় নাগ তাঁর যৌবনকালেই অরবিন্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং অরবিন্দের জীবনে একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত। অরবিন্দ যেমন একদিন অকস্মাৎ কলকাতা থেকে চন্দননগরে অন্তর্ধান করে সেখানে স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের বাড়িতে কিছুকাল কাটান তেমনই একদিন সেখান থেকেও তাঁর অন্তরাত্মার নির্দেশে ফরাসি ভারতের পণ্ডিচেরি শহরে চলে আসেন বিজয় নাগকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর এই পণ্ডিচেরি যাত্রার ইতিহাসে একটু ট্র্যাজেডি-কমেডির সুর আছে।

কথা ছিল অরবিন্দ চন্দননগর থেকে নৌকা করে কলকাতার বন্দরের দিকে রওনা দেবেন আর বিজয় নাগও কলকাতা থেকে নৌকাযোগে গিয়ে মিলিত হবেন অরবিন্দের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে। উভয়ের মিলন গঙ্গাবক্ষে না হওয়ায় অরবিন্দকে বাধ্য হয়ে কলকাতার মাটিতে পা দিতে হয়েছিল। এ যে কতখানি বিপজ্জনক তা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না। কারণ, গোয়েন্দা পুলিশ অরবিন্দকে পাকড়াও করার আশায় তখনও সম্পূর্ণ সচেতন। যা হক, অনেক খোঁজাখুজির পর বিজয় নাগের দেখা পাওয়া গেলে অরবিন্দ ও বিজয় একখানি ঘোড়ার গাড়িতে সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্দরের দিকে যাত্রা করে যখন সেখানে পৌছলেন তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। সেদিন ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ। পরের দিন ১লা এপ্রিল ফরাসি স্টীমার 'ডুপ্লেক্স' ছাড়বার কথা। অরবিন্দের আর এক প্রিয়পাত্র ও সহকর্মী সুরেশ চক্রবর্তী অরবিন্দের নির্দেশ পেয়ে আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরিতে, সেখানে অরবিন্দের জন্ত বাসস্থান ঠিক করতে। ১লা এপ্রিলের স্টীমারে উঠলে সে স্টীমার পৌছবে পণ্ডিচেরিতে ৪ঠা এপ্রিল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কেন না সব কাজের জন্তেই নিয়মকানুন মানতে হয়। যাত্রীদের স্টীমারে উঠতে হলে তার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা না হলে ছাড়পত্র পাওয়া যায় না। বন্দরে সন্ধ্যার সময়ে উপস্থিত হলে সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যেত যথাসময়ে। রাত্রি ১১টায় ডাক্তারকে বন্দরে পাওয়া গেল না, তিনি বন্দর ছেড়ে শহরে চলে গেছেন তাঁর বাসস্থানে। সেখানে ছুটতে হল এই দুই যাত্রীকে। কপাল ভাল, তাই সাহেব ডাক্তার তখনও জেগে ছিলেন। সাহেব বললেন—এত রাত্রে তাঁকে ডবল ফি না দিলে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন না। অরবিন্দ মনে মনে হয়ত বললেন, ডবল কেন, ডবলের ডবল দিতেও তিনি রাজী। অরবিন্দ ও বিজয় ছদ্মনাম নিয়েছিলেন যথাক্রমে যতীন্দ্রনাথ মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র বসাক। যা হক, যতীন্দ্রনাথ মিত্র যখন ডবল ফি দিতে রাজি হলেন তখন খাস ইংরেজ ডাক্তার তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মনোযোগী হলেন। অতখানি রাত্রি হয়েছে তো। সাহেব বেশ রঙে ছিলেন। অরবিন্দের মুখের ইংরেজি শুনে সাহেব মহাখুশি। আরে, এযে তার জাতভাইয়ের মুখের ইংরেজি শুনেছেন যেন তিনি। এমন সুন্দর ইংরেজি ও বলবার ভঙ্গি এর আগে তো কোন ভারতীয়ের মুখে শোনেন নি তিনি। সাহেব তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্তে অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি করে সম্ভব হল? অরবিন্দ জবাবে বললেন অনেককাল তিনি সাহেবের দেশে কাটিয়েছেন কিনা তাই। ডবল

কি আর তার উপর এই যতীন্দ্র মিত্রের মুখের ইংরেজি একেবারে বাজিমাৎ করে দিল। ডাক্তার সাহেব উভয়কেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। ৪ঠা এপ্রিল যথারীতি যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক পণ্ডিচেরির মাটিতে পা দিলেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরি যাত্রার সহচর এই সেই বিজয় নাগ। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই যুবক একটা বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় আশ্রমে অনেককাল কাটিয়ে যখন এলেন তখন তাঁর পটভূমিকার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলাম। কিন্তু একি! পরের চিঠি এভাবে ছিনিয়ে নেওয়া কোন্ দেশী ভদ্রতা তা আদৌ বুঝতে পারলাম না। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। সাধনায় তো শুনেছি অন্তরের প্রচ্ছন্ন আলোই ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কিন্তু তার কোন আভাসও নেই এতে, আছে শুধু তমসা।

কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরও যখন চিঠিখানি ফেরৎ পেলাম না তখন আশ্রমে নলিনীকান্ত গুপ্তকে ব্যাপারটি জানিয়ে একখানি চিঠি দিলাম। তাতে আমার ক্রোধই প্রকাশ পেয়েছিল। লিখেছিলাম—আশ্রমের ফ্যাক্টরিতে তৈরি যে মালের নমুনা পেলাম তাতে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছি। দেব-মানবের জন্ম আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে!

এর উত্তর তিনি যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা হারিয়ে গেছে। যতদূর মনে আছে তাতে বোধ হয় তিনি লিখেছিলেন—এখানে পা দিলেই কিংবা কিছুকাল থাকলে মানুষ সোনায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে এ ধারণা ভুল। এটা মানুষের রূপান্তর ঘটাবার ফ্যাক্টরি তো বটেই। সবটা নির্ভর করে মানুষটা কোন্ ধাতুর তার উপর। অনেক গড়িয়েপিটিয়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত ঝড়তিপড়তি লোহা হিসাবেও বরবাদ হয়ে যায়। তা বলে হতাশ হবার কিছু নেই।

আমি মেসে খেতাম কিন্তু এই দোকানেই আমার আবাস। বিজয় নাগের ধ্যানের বাধা হচ্ছিল বলে ইতিমধ্যে আমাকে মেসেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল।

দিন যায় আর নিত্য নতুন এক একটা উপসর্গ সৃষ্টি হয়। বিজয় নাগের মুখে হাসি ফুটতে দেখি না। সাধকের মুখে গাম্ভীর্য ধরে রাখাই হয়ত স্বভাবিক, এইটাই মনে করি।

আমার প্রতিকাজে বিজয় নাগ একটা ভাষ্য করে বসেন, বুঝলাম তাঁর অনুমোদন দরকার। সব সময় একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

বন্ধুরা আসেন কিন্তু কারও আর সহজ ভাবে কথা বলবার উপায় নেই। এসেই দেখে এক নতুন লোকের আগমন এখানে। এঁকে তো কেউ কখনও দেখে নি এখানে এর আগে! ব্যাপার কি জানবার জন্যে সবাই উৎসুক।

দোকানের সামনে প্রশস্ত বারন্দায় কেউবা একটু আড়ালে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে—ব্যাপারটা কি?

বলি, ব্যাপার কিছুই বুঝছি না। ইনি অমুক। পণ্ডিচেরি থেকে এসেছেন বোধ হয় আর্য পাবলিশিং হাউসের রূপান্তর ঘটাতে। তবে কিভাবে এবং কার নির্দেশে তা কিছুই জানতে পারি নি।

আমার কাগজের অফিস ইতিমধ্যেই লালবাতি জেলেছিল, সুতরাং আমি অতঃপর সারা সময় এই দোকানের কাজেই নিযুক্ত থাকতাম। অত্যন্ত পীড়াদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলাম। বন্ধুদের আসা-যাওয়া বিরল হয়ে পড়ল। একে একে নিবিছে দেউটি।

বিজয় দাশগুপ্ত পড়ল মুস্কিলে। আমরা একই ঘাটে জল খেতাম। কিন্তু সে ঘাট ধ্বসে যাওয়ায় আমাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলবার জায়গা ছিল একমাত্র এখানেই। বেচারি ভবানী মুখুজ্যে রেলওয়ে অফিসে চাকরি করত। ছুটির পর ছুটে আসত এইখানে। হয়ত সন্ধ্যা ছয়টা গড়িয়ে গেছে। দেখে দোকানের দরজা বন্ধ।

ব্যাপারটা চরমে উঠল যেদিন প্রমথ চৌধুরী এলেন। ঘরে ঢুকেই অভ্যাসমত সিগারেট ধরালেন। তিনি ছিলেন অবিরাম ধূমপায়ী, ইংরেজিতে যাকে বলে চেইন-স্মোকার। তাঁর হাতের কয়েকটা আঙুল অবিরাম ধূমপানের ফলে একেবারে হলুদবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলছেন আর মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিচ্ছেন, আবার কখনও বা দু টান দেবার পর সিগারেটটি আঙুলের ডগায় ধরা অবস্থায়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেল: ব্যাস্, আবার একটি ধরালেন।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর অন্যদিকে খেয়াল ছিল না। বোধ হয় দুটি সিগারেট শেষ হয়েছে, তৃতীয়টি ধরাবার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল এক টুকরো মোটা পিসবোর্ডে লেখা আছে—'No Smoking'. শুধু এক টুকরো নয়, আরও কয়েক টুকরো আমার টেবিলের তিন পাশে লটকান আছে। হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন প্রমথ চৌধুরী।

উঃ সর্বনাশ!—বলে একবার আমার মুখের দিকে, তারপর ঐ কাগজের টুকরোগুলির দিকে চেয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার চেয়ার

ছেড়ে উঠে তাঁকে এগিয়ে দিলাম নিচে অবস্থিত তাঁর মোটর পর্যন্ত। ঐ নিবেধাজ্ঞা কার তা তাঁকে সব খুলে বললাম। এমন অপমানিত জীবনে বোধ হয় কোথাও তিনি হন নি। এই ব্যাপারে আমিও লজ্জিত, সঙ্কুচিত এবং অপমানিত বোধ করলাম। এইদিনই ঠিক করে ফেললাম এখানে আর নয়।

বিজয় নাগের ভাইপো রাধাকান্তকে সব বুঝিয়ে দিয়ে ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরেই আমি সরে পড়লাম এখান থেকে।

নবীন কুণ্ডু লেনে আমার মেসে তখন আমি অধিবাসী। সেখান থেকে নাটকের যবনিকা পতনের কথা নলিনী গুপ্তকে জানালাম আর অনুরোধ করলাম বিজয় নাগ যে চিঠিখানি আমার টেবিল থেকে লুফে নিয়ে গিয়েছিলেন তার একটা নকল যেন তিনি দয়া করে আমার মেসের ঠিকানায় পাঠান, কারণ সে চিঠির রহস্য তখনও পর্যন্ত আমার অজ্ঞাত।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে নলিনী গুপ্তের চিঠি পেলাম—

শ্রীঅরবিন্দ আপনাকে এই কথা জানাতে বললেন যে আপনার চলে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত (regret) ; তবে চিঠিপত্র লিখতে থাকবেন।

আর যে চিঠিখানি খোয়া গিয়েছিল তার একটি নকলও তিনি চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালেরই অক্টোবর মাসে। চিঠিখানি লেখা ইংরেজিতে। হুবহু এখানে তুলে দিলাম—

To

Sasankamohan Choudhuri

Bijoy has started for Calcutta and will be there before my letter reaches you. Please note that he has not gone on any mission nor does he carry any authority or instructions from Sri Aurobindo. He has gone on his own motion—he is not sent by Sri Aurobindo.

Nolini Kanta Gupta

Sri Aurobindo Asram

Pondicherry.

15. 10. 33

বেশ বোঝা যায় চিঠিখানি লেখা হয়েছিল অরবিন্দেরই নির্দেশ অনুযায়ী। একটা প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায় আমার প্রতি সতর্কবাণী যেন। রহস্যটা এবার

আমার চোখে স্বচ্ছ হয়ে উঠল। বিজয় নাগের মস্তিষ্কে একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

বারীনদার সেই কথাটা বার বার মনে পড়ে—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।'

ঐ ঘটনার কিছুদিন পর বিজয় নাগ কোথায় যেন চলে যান এবং স্বল্পকালের মধ্যেই এই বিচিত্র ধরাধামের মায়া তিনি ত্যাগ করেন।

বারবেলা বৈঠকের সমাধি হয়ে গেল। কিন্তু আমার স্মৃতিতে বেঁচে রইল কত বন্ধুর কত দিনের প্রাণঢালা আশ্লেষ। কত মানুষের কত জীবনধারা এসে মিলেছিল আমার হৃদয়-জলধিতে। সেই জলধিতে ডুব দিয়ে আজ তুলে আনি কত রত্নরাজি—বিচিত্র তাদের রঙ, বিচিত্র আভায় উজ্জ্বল তারা। একটি টুকরো কথা, একটু হর্ষধ্বনি, একটু বা ব্যথা-বেদনার ক্রন্দনস্বর—সব একাকার হয়ে মিশে যায় এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ছন্দোবদ্ধ ঐকতানে!

বন্ধুদের দিকে চেয়ে অবাক হই। তাদের মধ্যে কেউ বা আজ প্রস্ফুটিত শতদল, কারও বা হৃদয়ের রজনীগন্ধার সৌরভ ভেসে বেড়ায় বাতাসে বাতাসে।

সবাই চলেছে বিবর্তনের তীর্থযাত্রায়। পথ কোথাও দুর্গম, বন্ধুর, কোথাও বা ঘন অন্ধকারের অন্ধ বিভীষিকা, পরিবেশের প্রতিফলিত রয়েছে এই মানুষেরই মনের ছবি—উত্থান অবতরণের মধ্য দিয়েই তো আদিকাল থেকে চলেছে মানুষের আনন্দলোকে পৌছবার প্রয়াস।

আজ আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই। যাঁরা আমাকে ভালবেসেছিলেন, যাঁরা কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি কেবল ঘৃণা ও বিদ্রূপ, যাঁরা করেছেন শত্রুতা, যাঁরা আমাকে দিয়েছেন নির্মম আঘাত—তাঁদের সবাইকে আজ আমি প্রণাম করি, আর অসংখ্য প্রণতি জানাই এই বৈচিত্র্যময় জগতের স্রষ্টাকে—যিনি তাঁর অনন্ত লীলামাধুর্যের মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন।

সমস্ত রস ঘনীভূত হয়ে আজ একটিমাত্র রসে পরিণত হয়েছে—সে রস আনন্দ রস। তাই ঋষি-কবির সুরে সুর মিলিয়ে আজ গাই—

> যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
> জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

নির্দেশিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২১	War against the British.	War against the British ?
৪	৪	সন্ধা	সন্ধ্যা
৫	১৬	আঁট হল	আঁটছিল
৬	২৬	ফুঠছে	ফুটেছে
৯	২৬	বধু	বধূ
১১	৯	চিড়ে	চিরে
	২১	মেঘমেলা	মেঘমালা
১২	৪	অওয়াজ	আওয়াজ
	১৯	এল	এলে
১৫	২২	চুম্বক,	চুম্বক
৩৪	২০	'লালা বাবা'	লাল বাবা
৩৫	২	লালা বাবার	লাল বাবার
৩৯	২৪	ছাটটা	ছাচটা
	২৬	একই,	একই
৪১	১২	মনবেদনা	মনোবেদনা
	১৪	ভাব	ভাল
৪৪	২৫	উদ্বেগ	উদ্বেল
৪৬	২২	হয়ে উঠলাম	উঠলাম
৫০	২৩	সিঙারা	শিঙাড়া
৫৬	৬	হওয়া	খাওয়া
৬০	৭	বুঝে	বোঝে
৬৫	৭	unecepted	unexpected
৭১	৮	ঘরে ছবির তাঁর	ঘরে টাঙানো ছবি
৭৬	৬	কথা ভাষা	কথ্য ভাষা
৮৭	২৪	চারিদিকে	চারিদিক
৯৪	৯	হয়	হয়ে
	৮	আদার্শ	আদর্শ